চলার পথে

শিপ্রা দত্ত

এই উপন্যাসের চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাল্পনিক কোথা
কোন সাদৃশ্য নিতান্তই দৈব দুর্ঘটনা বা অনিচ্ছাকৃত ॥

প্রথম প্রকাশ—১লা আশ্বিন, ১৩৬৯

মেজদা (সুবিমল দত্ত),

আমার লেখা পড়ে তুমি আনন্দ পেতে।
লিখতে আমাকে কত না উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছে।
তোমার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে
এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম।—

সতীর ছাত্রী জীবনে সমাপ্তির রেখা পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সোপান কৃতিত্বের সঙ্গে সে অতিক্রম করেছে। দীর্ঘ কালের 'ছাত্রী'র নামাবলী ত্যাগ করেছে। এবার তাকে নতুন উত্তরীয় পরিধান করতে হবে। কর্ম স্পৃহার প্রথম উন্মাদনায় কর্ম সায়রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

মেয়েদের আজ হরেক রকমের কাজের দরজা খুলে গেছে। পাশ্চাত্যের মত প্রাচ্যের মেয়েরাও রকমারি কাজে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে সঙ্কোচ করে না আজ। কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক—সব ক্ষেত্রেই আজ মেয়েরা পুরুষের সমদক্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

যোগ্যতানুসারেই মেয়েরা বিভিন্ন কর্মস্থলে আপন ভাগ্যকে জড়িয়ে দিয়ে নিজের ও দেশের উন্নতির সহায়ক হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মেয়েরা কেবল অন্তঃপুরচারিণীই নয়। তারাও 'চরৈবেতি'র মহামন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে জাতি ও দেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে।

ছোটবেলা হতে সতীর শিক্ষাব্রতীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম। তাই কর্ম জীবনের সূচনায় বেছে নিল সে এই পবিত্র ব্রত।

মানুষ গড়ার কারখানার মত এত পবিত্র প্রতিষ্ঠান সমাজে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রাচীন যুগ হতেই এই ব্রতের প্রতি গভীর নিষ্ঠা অনুরাগ দেখা যায়।

বৈদিক যুগে গুরু গৃহে বিনা শুল্কে শিষ্যরা অধ্যয়ন করত। প্রতিদানে গুরু ও গুরুপত্নীর পরিচর্যা করে শিক্ষা সমাপান্তে গুরু-দক্ষিণা দিত।

বৌদ্ধ যুগেও গুরু শিষ্যের পাঠ দান ও গ্রহণের এক অপূর্ব প্রথা সম্বন্ধে আমরা পড়ে থাকি। বৌদ্ধ যুগে মঠেই শিক্ষা দান প্রচলিত ছিল।

সে সব দিনের কথা ইতিহাসের পাতায় আজ লিপিবদ্ধ। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দানের বিধি ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

সতীর যুগেও সে দেখেছে শিক্ষাব্রতীর জীবন ভোগ, বিলাসের, ঐশ্বর্যের দীনতা হীনতার জীবন ছিল না, সেখানে ছিল ত্যাগ, উদারতা, সত্যনিষ্ঠতা, নিয়মানুবর্তিতা।

তাঁদের সামনে মাথা শ্রদ্ধায় আপনা হতে নীচু হয়ে যেতো। কি এক পবিত্র ভাব মাখা ছিল এঁদের মুখে, পোষাকে, আচারে ব্যবহারে। তাঁদের সৌম্য শালীন মার্জিত রুচির পরিচায়ক পোষাক ও চেহারা ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতো।

কি সুন্দর জীবন! শিক্ষাব্রতকে জীবনের আদর্শ করে এঁরা শিক্ষা দান করতেন। তাই শিক্ষা দানের ব্যাপারে তাঁদের যেমন ছিল না কোন ফাঁকি, তেমনি জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করে তাঁরা অমৃত ভাণ্ডার উদ্ধার করে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করতে কখনও কার্পণ্য করতেন না। ছিল না তাতে কোন রকম ভেজাল।

এসব মহত্ত্বের জন্য শিক্ষাব্রতীর আদর্শের প্রতি সতীর ছিল সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ও অনুরাগ। শিক্ষাব্রতীর সৎ সুন্দর ও নির্মল জীবন তাকেও হাতছানি দিয়ে ডাকতো সেই ছোট্ট বেলা হতে।

কর্ম জীবনের সূচনায় দার্জিলিং এর একটা শিক্ষা নিকেতন হতে ডাক আসলো সতীর। অনেক আশা সম্ভাবনাকে মূলধন করে সতী সেই ডাকে সাড়া দিয়ে চললো সেই রম্য নন্দন কাননে।

সারা পথ কল্পনায় দেখল কত রঙ্গীন স্বপ্ন। সে-ও হবে তার শিক্ষিকাদের মত আদর্শবতী, নিষ্ঠাবতী—যাতে তার ছাত্রীরাও তাকে শ্রদ্ধা করে হবে তার অনুগামী।

এরূপে সে গড়ে তুলবে এক জটিল কুটিল সমাজের পরিবর্তে এক
ত্য সুন্দর নির্মল ও উজ্জ্বল ছাত্রী সমাজ।

যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে সে যাচ্ছিল, তার সবে
স্নুমোদগম হচ্ছে। এখনও ফুলে ফলে শোভিত হয়নি। তা সুন্দর
স্থায়ী করার দায়িত্ব নিয়েই সতী চলেছে।

প্রকৃতির লীলা ভূমি, বিশ্বকর্মার নিপুণ তুলির টানের পরিচয় যে
দশের আকাশে বাতাসে, মাঠে প্রান্তরে যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে—সেই
ন্য ভূমি হবে সতীর জীবনের প্রথম কর্মভূমি।

যতই পথ এগিয়ে চলেছে, প্রাকৃতিক নানা সৌন্দর্য যেন ততই
তীকে মুগ্ধ করছে। কল্পনা বিলাসী সতীর মনের মণি কোঠায়
ানন্দের জোয়ারে বান ডাকল।

প্রকৃতির মত তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিও যদি এমনি ভাবেই তাকে
াকৃষ্ট করতে পারে, তবে অধ্যাপনা জীবনের নিষ্ঠার সাক্ষ্য সে রেখে
াবে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছাত্রীর মধ্যে। যারা হবে অনাগত
ভবিষ্যৎ যুগের নাগরিকদের মা, বোন, সহধর্মিনী।

শৈল শিখরে অবতরণ করে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে
ালাপ আলোচনার মাধ্যমে সতী শিক্ষা কেন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কিছুই
জানতে পারলো।

প্লেইন্ লিভিং হাই থিংকিং—এই ইংলিশ প্রবাদ বাক্যের উপর
্রতিষ্ঠিত করবেন নচিকেতা সামুই তাঁর প্রতিষ্ঠান।

শিশু গাছটিকে একদিন মহীরুহে রূপান্তরিত করার কল্পনা
রছেন তিনি। একই সঙ্গে চলবে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও
বিদ্যালয়ের তিনটি শাখায় শিক্ষা দান।

প্রশ্ন করে সতী জানতে পারলো—সে ছাড়া আর একজন মাত্র
... বাইরের থেকে এসেছেন। তাছাড়া সামুইর মেয়েরা, সস্ত্রীক
তিনি এই দুই শিক্ষিকার সঙ্গে মানুষ গড়ার কারখানায় হাত
াগাবেন।

সামুই-ই ঐ শিক্ষা কেন্দ্রের সর্বেসর্বা। তিনিই প্রেসিডেণ্ট কাম সেক্রেটারী কাম হেড্ অফ দি ইনষ্টিউশন কাম ক্লার্ক। তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

স্কুল সম্বন্ধে ফাষ্ট হ্যাণ্ড নলেজ সতীর যা হল—তাতে তার কল্পনা বিলাসে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগল।

স্কুলের স্বতন্ত্র কোন বাড়ী নেই। নচিকেতা' সামুইর আবাস স্থলের খান্ কয়েক কক্ষেই স্কুল জুড়ে বসেছে। নেই কোন অফিস রুম, শিক্ষিকাদের কমন রুম, লাইব্রেরী, ছাত্রীদের স্পোর্টসের বা শিল্প শিক্ষা বা কোন রকম কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা, এমন কি স্কুলের জন্য নিয়োজিত কোন পিয়ন, ভৃত্য বা পরিচারিকাও নেই।

সতীকে জানানো হয়েছিল টীচারদের হোষ্টেল আছে। কিন্তু দেখা গেল—সেখানেও ভেজাল। সামুইর বাড়ীর একটি কক্ষে সতী ও মনীষার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়ার ব্যবস্থাও তাঁরই হোটেলে।

ছাত্রছাত্রী—দুই-ই আছে সামুইর শিক্ষা কেন্দ্রে। এরা সবাই নেপালী, ভুটিয়া অর্থাৎ সবাই পাহাড়ী। বাঙ্গালী বা অন্য কোন দেশীয় ছাত্রছাত্রী নেই। যদিও দার্জিলিং সহরে ভারতের নানা রাজ্যের নানা সম্প্রদায় ও ধর্মের ছাত্র ছাত্রীরা অধ্যয়ন করে।

সামুই একাই বোধ হয় এই সব দরিদ্র পাহাড়ীদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করবার জন্য মশাল জ্বালিয়েছেন। তাই অসীম ধৈর্য সহকারে আস্তে আস্তে তিনি গড়ে তুলবেন এই কারখানা তাঁর একক প্রচেষ্টায়।

ছাত্রছাত্রীরা সকলেই দরিদ্র বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কেউ বা চা বাগানের মজুরের সন্তান, কেউ বা সব্জীওয়ালার সন্তান—এমনি নানা ছোট ছোট কাজ করে এদের অভিভাবকরা। এরাও অবসর সময় সাহায্য করে মা বাবাকে

কত আশা বুকে নিয়ে এসব সরল, সুন্দর পাহাড়ী সন্তানেরা ছুটে

এসেছে সামুইর শিখা কেন্দ্রে। একদিন শিক্ষা সমাপান্তে তারাও বড় কাজ করবার যোগ্যতা অর্জন করবে, দূর হবে পৈত্রিক পেশার চির সহচর অভাব ও অনটন।

তারাও মানুষের অধিকার লাভ করবে সর্বতোভাবে—কেবলমাত্র পোষাকে পরিচ্ছদে নয়, জ্ঞান গরিমায় ও আদর্শ জীবন যাপনে। ত্নিয়ার পথে জোর কদমে এগিয়ে যাবার যোগ্যতার পাসপোর্ট পাবে এই শিক্ষা কেন্দ্র হতে। কালক্রমে প্রাথমিক হতে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত স্তরে স্তরে উঠে যাবে এরা।

পাবিপার্শ্বিক অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্র হতে তাদের শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিও যে কোন প্রকারে হেয় নয়—তা একদিন সবাই দেখবে, জানবে। কত আশা ভরা বুক নিয়ে ছুটে এসেছে এইসব সরল বালক বালিকা, কিশোর কিশোরীবৃন্দ।

গরীবের প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণা কিন্তু গরীবের মত নয়। পবন্ত স্থানীয় বাঙ্গালী স্কুলগুলি হতে অনেক অনেক বেশী। অনেক দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর সামর্থ্যের বাইরে এই দক্ষিণা।

তব না খেয়ে দেয়ে বহু কষ্টে মাস মাহিনে জোগাড় করবার গুরু দায়িত্ব নিয়ে এবা ছুটে এসেছে দার্জিলিং এর নানা চড়াই উৎরাই এর পথ বেয়ে।

অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনায়, সরল বিশ্বাসের ভিত্তিতে দলে দলে ছুটে এসেছে সামুইর প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করে তুলতে। তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আপ্লুত সরল মুখগুলি আকৃষ্ট করে ছিল সতীকে।

এত আশা, এত অর্থ ব্যয়, এত কষ্ট করে এই সব সরল পাহাড়ীরা এত দূর শিক্ষার হাটে ছুটে এসেছে কেবল প্রতারিত হতে—এটা বুঝতে সতীর বিলম্ব হয়নি।

তেমনি সতী ক্রমেই বুঝতে পারল—বিশ্বাসের ভিত্তিতে আত্মীয় পরিজন ছেড়ে ছুটে আসা তারও উচিত হয়নি। প্রবঞ্চিত হয়েছে সে-ও। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাই ধাক্কা দিল সতীর আদর্শবাদী

মনকে। তবু ভাবলো দেখাই যাক্ না ভাগ্যের পরিহাস কত দূরে নিয়ে যায়।

জীবনের প্রথম ধাপে পা ফেলে যে বিরাট ফাটল তার গতি রোধ করল—তাতে তার এত দিনের রঙ্গীন স্বপ্ন ভেঙ্গে যেন চুরমার হতে চলল।

মণীষা এসেছে সতীর থেকে কয়েক দিন আগে। সুতরাং মণীষার সঙ্গে আলাপের সুরুতেই জিজ্ঞাস্য হলো তার এই কয় দিনের কিছু অভিজ্ঞতা।

রসিকা, সরলা, বুদ্ধিমতী মণীষা উত্তর দিল—নচিকেতা বাবুর নামটা ঠিক হয়নি। ঋষিতুল্য স্বভাব, চেহারা, প্রকৃতি কিছুই তাঁর নয়। পরন্তু এমন একটা নাম তাঁর রাখা উচিত ছিল—যা তাঁর যোগ্য চরিত্রের প্রতিবিম্ব হত। অন্ততঃ আমার আপনার মত সরলা বোকা মেয়েদের প্রতারিত হতে হত না।

কারণ আপনাকে উদয়াস্ত খাটতে হবে ঘানির বলদের মত পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে চলবে আপনার আহার্য মার্কা কিছু অখাদ্য বস্তু। তাই প্রসন্ন চিত্তে গলাধঃকরণ করে—ঋষি মহাঋষিদের প্রবচন বাক্য—প্লেইন্ লিভি, হাই থিংকিং এর মরফিয়ায় দেহটাকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে মণীষীদের সার কথার মর্ম উদরস্থ করে বেশী দিন এই দেহটিকে টেকাতে পারবেন না।

সতী প্রশ্ন করল—আপনার অভিজ্ঞতার সুরুতেই এমন হতাশার রাগিণী শোনা যাচ্ছে যে—ব্যাপার কি? সবিস্তারে শোনান সব।

এখানে এসে আমিও যেন কেমন বুদ্ধু বনে গেছি। আশার আলো কোথাও দেখছি না। তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে। যদি আপনি তার কোন নিশানা জানেন।

শুনুন তবে ক্রমান্বয়ে সব। খাদ্য তালিকাটাই প্রথম পেশ করা যাক্—কি বলুন? আপনাদের মত যুবতী তন্বীদের এই ধরণের

মেশিনের মত পরিশ্রমের বিনিময়ে—প্লেইন্ লিভিং এর ফরমুলার মিতাহারের মেনুটা শুনে রাখা প্রথমেই উচিত নয় কি?

কতটা তেলে কত ঘণ্টা মেশিন চল্‌তে পারে সে সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানটা নিশ্চয় আছে। বিশেষ করে এই পার্বত্য অঞ্চলে শীত প্রধান দেশে যেখানে মেশিনে তেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিঃশেষ হয়ে যায় প্রাকৃতিক কেরামতিতে।

সতী স্মিত হাস্যে বলল—বিশেষণ পর্ব সংক্ষিপ্ত করে, মূল প্রসঙ্গে আসুন। কতটা ঠক্‌লাম এতটা চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে সুদূর শৈল শিখরে আরোহণ করে—সেটাই জানবার জন্য আমি উৎসুক।

মণীষা সহাস্যে উত্তর দিল—ধীরে, এহো বাহ্য, ধীরে। প্রথমেই বেলা ৮॥। ৯ টার সময় ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের কিছু একটা পড়া দিলে আপনার ডাক পড়বে ঠাণ্ডা ফিকে চা, পোড়া তুই স্লাইস পাউরুটি টোষ্ট। তাতে মাখনের স্পর্শ আছে কিনা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখ্‌তে হবে, স্বাদে তা অনুভব করতে পারবেন না। টোষ্ট দ্বয় চামড়ার মত শক্ত। দাঁতে কাটতে কষ্ট হবে। দাঁত যদি আপনার তেমন শক্ত না হয়, তবে রুটির দৌলতে হয়ত দাঁত মায়া কাটিয়ে সরে পড়বে।

তারপর আবার ফিরে এসে জুড়ে দিন সেই ঘানিতে। বেলা ১॥/২টার সময় আবার আপনার অন্তঃপুরে ডাক পড়বে। এবার ক্লাস-ওয়ার্কের নামে ছাত্র-ছাত্রীদের সাময়িক কালের জন্য হৈ হুল্লোড় করবার অবকাশ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করতে হবে পোড়া ভাত বা বেশী সিদ্ধ ভাত যাকে এক কথায় ফেন ভাত বলা যেতে পারে—তার সঙ্গে ডালের জল।

ঐ জল হতে উদ্ধার করতে পারবেন না কি জাতের ডাল। একটা তরকারীর ঘ্যাট্‌ও মিলবে। যদি কদাচিৎ মাছ ভাগ্যক্রমে আপনার পাতে ঘ্যাটের সঙ্গে পড়ে, তার স্লাইজ হবে ডালনার আলুর মত। না-না-দমের আলুর মত অত বড় নয়। এবং পরিমাণে হয়ত ঐ একটি

টুকরো। সুতরাং তার থেকে কোন জাতের মৎস্য তা নির্ণয় করতে পারবেন না।

ডিম বা মাংসের চেহারা অদ্যাপি দেখিনি।

বিকেলে ৫।৫॥ টার সময় আবার ডাক পড়বে সেই ফিকে ঠাণ্ডা এক কাপ চা ও দুটো কোলে বিস্কুট। এই হল বৈকালিক জল খাবার পর্ব।

তিন সিফ্‌টে সারা দিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর আপনার যখন ছুটি হল—তখন পাহাড়ী অঞ্চলে অন্ধকার নেবে এসেছে। ঘন কুয়াসার জাল ভেদ করে ধাপে ধাপে পাহাড়ের কোল হতে দীপান্বিতার আলো জ্বলে উঠেছে।

পাহাড়ী অঞ্চলে এই সময় গৃহের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কারণ ঠাণ্ডার জন্য পাহাড়ীরা সন্ধ্যা হলেই কিছু মাদক দ্রব্য পান করে শরীরকে চাঙা করে ও দূর করে সমস্ত দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত প্রকৃতি রাণীর দেশে এসেও আপনার পক্ষে দুদণ্ড ঘরের বদ্ধ হাওয়ার বাইরে যেয়ে মুক্ত হাওয়া সেবন করা বা প্রকৃতি সৌন্দর্য উপভোগ করা সম্ভব হবে না।

সন্ধ্যাটা কোন একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্য দিয়ে যে কাটাবেন তারও উপায় নেই। এদের না আছে কোন লাইব্রেরী, না আছে কোন ইন্‌-ডোর খেলার ব্যবস্থা।

এঁরা তাদের পারিবারিক আলাপ আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আমার আপনার যে সময়টা কি ভাবে কাটানো সম্ভব—সে বিষয়ে চিন্তা নেই।

এত দিন আমি এদের আসরেই গিয়ে বসতাম। কিন্তু পরনিন্দা, পরচর্চা ছাড়া আর কোন স্বাস্থ্যকর, শ্রুতি সুখকর বা উপভোগ্য ভাল আলোচ্য বিষয় বস্তু তাদের আলাপের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

অন্যের সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল এদের প্রচণ্ড। সামুই মশায়ের

পারিবারিক জীবনও বোধ হয় সুখের ও শান্তির নয়। কয়েকটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদের সঙ্গেও বাপ মার বনিবনা তেমন নেই। জোড়াতালি দিয়ে বাইরের ঠাঁট বজায় রেখে চলেছে মাত্র।

আপনি বহিরাগত হলেও সবই জানতে বুঝতে আপনার বেশী দেরী হবে না। পরন্তু আপনার কাছেই হয়ত একে অন্যের বিরুদ্ধে বোঝাবে। সুতরাং রেখে ঢেকে কিছু বলা কওয়া অন্ততঃ এঁরা আমার আপনার সামনে তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু লুকাবে না।

ঐ যাঃ, ডিনারের মেনু তো বলা হল না। হ্যাঁ, রাত ৯॥। ১০ টার সময় খাবার ডাক পড়বে আপনার। সেই ঠাণ্ডা ভাত, ডালের জল ও ঘ্যাট্। রান্নাটা বিকেলেই গিন্নী সেরে রাখেন। সারাদিন রন্ধন শালায় থাকা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং তরকারী বা ডালও বোধ হয় সকালের তৈরী।

এসব খাদ্য খাবার সময় অন্ততঃ গরম করে দেবার কায়ক্লেশটাও এঁরা নিতে রাজী নন্। আপনার যদি কোন রকম এসিডিটির রোগ থেকে থাকে---তবে এসব বাসি, ঠাণ্ডা বস্তু আহারের পরিণামে অচিরেই আপনার আল্‌সার বা পেপ্‌টিক্ আলসার হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। এবং সামুইর প্লেইন্ লিভিং হাই থিংকিং এর ভিত্তিতে যদি আপনার পৈত্রিক প্রাণটা যায়---তবে আপনি তাঁর অভিযানের 'শহীদ' হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

সংক্ষেপে জানালাম আপনাকে এই আদর্শ স্কুলের ইতিহাস ও তৎ প্রতিষ্ঠাতার ইতিহাস। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ভূয়া আদর্শের মোহে কর্ম জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই কতটা বিভ্রান্ত আমাদের হতে হচ্ছে।

সতীর আদর্শে বুঁদ হওয়া মন সামুইর আদর্শ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে মনীষার অভিজ্ঞতার মর্ফিয়ায় যেন ঝিমিয়ে পড়ছিল।

চারিদিকের পরিস্থিতি দেখে শুনে সতীর আশার ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই

যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিল। তবু এসে যখন পড়েছে, তখন তার দিক্‌ থেকে কর্তব্যের যাতে কোন ত্রুটি না হয় সেটাই করবে মনস্থ করল।

রাত্রে পাশা পাশি দুটি খাটে শুয়ে সতী ও মনীষা গল্প করতে করতে ভারাক্রান্ত দেহ মন নিয়ে কখন সতীর চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল—সে তা টের পায়নি।

হঠাৎ নিশীথ রাতে নারীর ক্রন্দন ধ্বনি শুনে তার সুখের নিদ্রা টুটে গেল। সতী মনীষাকে ডাকলো। ঘুমন্ত স্বরে মনীষা উত্তর দিল--কি বলছেন?

—কে কাঁদছে এত রাত্রে?

---নতুন না। এ অভিনয় প্রতি রাত্রেই শুনতে পাবেন। ঘুমিয়ে পড়ুন।

সতী বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করল--কি আবোল তাবোল বকছেন ঘুমের মধ্যে। রাত্রে কোন্‌ মহিলা এমন ভাবে কাঁদছে? কে তাকে পীড়ন করছে? শাসন করছে?

--বললাম তো---এ ব্যাপার নতুন নয়। প্রতিরাত্রেই এই প্রহসন চলে। স্বামী পরিত্যক্তা এক নারী সারাদিন নিজেকে নানা উপচারে সজ্জিত করে কামার্ত হয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ একটি যুবককে প্রলুব্ধ করে বেড়ায়। তার উদগ্র কামনায় আহুতি দেবার জন্য যুবকটিকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে থাকে।

আর নিশীথে নিগ্রহ চলে সেই মেয়েটির উপর তার পিতা মাতার। স্বামী পরিত্যক্তা জননী সে। কিন্তু সন্তানের প্রতি নেই তার কোন আকর্ষণ বা কর্তব্য। সে যেন ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে মধু আহরণেই ব্যস্ত থাকে সারাদিন।

স্বৈরাচারিণীর উপর তাই প্রতি নিশীথ রজনীতে চলে নির্যাতন। তমসা রাত্রির প্রতিশ্রুতি তার--ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় মুছে যায়। তাই দৈনন্দিনই একই প্রহসনের পুনরাবৃত্তি চলে। কোন পক্ষই পরাভব স্বীকার করবে না।

শুয়ে থাকুন। ঘুমিয়ে নিন্। এই ঘুমটুকুই কেবল মাত্র আমাদের দুজনের জীবনে নির্ভেজাল। সুতরাং এটিকে ষোল আনা ভোগ করে ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার করে নিন---বলে মনীষা পাশ ফিরে শু'ল।

সতী শুয়ে মনে মনে হাসলো রসিকা মনীষার কথা শুনে। ঘুমন্ত মনীষার মুখে রসের অভাব নেই। এ কটা দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বেচারী মুহ্যমান। তাই এখানকার সব কিছুকেই ব্যঙ্গ মিশ্রিত রসে সিক্ত করে পরিবেশন করতে চায়।

কিন্তু দিন যতই কাটতে লাগল সতী মনীষার প্রতিটি উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করতে লাগল। সতী ও মনীষা বুঝতে পারলো শিক্ষার নামে কিছু সরল দরিদ্র পাহাড়ী ছেলে মেয়ের সঙ্গে চলেছে প্রবঞ্চনা।

সতী ও মনীষাকে চাকরীর নিয়োগ পত্র দেবার সময় জানানো হয়নি যে তাদের নেপালী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। তবে এরা কেউ-ই এত দূর দেশে চাকরীর জন্য আসতো না।

একদিন তাই বিরক্ত হয়ে সতী সামুইর এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন করল যে ভাষা আমরা জানি না, সেই ভাষার মাধ্যমে কি করে শিক্ষা দেব?

তিনি উত্তরে বললেন---আপনারা দুজনেই সংস্কৃত জানেন। দেব-নাগরী অক্ষর চেনেন। সুতরাং আমি কয়েকটা নেপালী বই এনে দেব---সেই বইগুলি পড়লে আপনারা এই ভাষা অতি সহজে শিখতে পারবেন। দেখবেন তারপর আপনাদের নেপালী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানে কিছু মাত্র অসুবিধা হবে না। তাছাড়া একটা নতুন ভাষা শেখার মধ্যেও তো আনন্দ আছে।

সতী বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল---ভাষা শেখার মধ্যে আনন্দ আছে সত্য। কিন্তু সেই ভাষা সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ব না করে, সেই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করতে যাওয়া কি ধৃষ্টতা নয়?

এর দ্বারা বিষয় বস্তু সম্যক্ রূপে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা

সম্ভব নয়। এবং ভাষার দূর্বলতার দরুণ ছাত্রছাত্রীরাও শিক্ষনীয় বিষয় সুষ্ঠ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

সামুই সতীর রোষের কারণ উপলব্ধি করে তাকে শান্ত করবার জন্য বললেন--এরা নেহাৎই মূর্খ। কোন প্রকারেই কিছু শিখতে পারবে না কোন দিন। তবু যেটুকু শেখানো সম্ভব—কেবল সেটুকু মাত্রই চেষ্টা করবেন। এর বেশী আপনাদের থেকে আশা করি না।

সতী বলল--ছাত্রছাত্রীদের শিখবার আগ্রহ আছে, নিষ্ঠা আছে, একাগ্রতা আছে। শেখালে এরা শিখতে অবশ্যিই পারবে। এবং এই শেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এরা এক একজন কত দূর হতে ছুটে আসছে।

কিন্তু তাদের জিজ্ঞাস্য বস্তু যদি আমরা পরিষ্কার ভাবে তাদের বোধগম্য হবার উপযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করতে না পারি, সেই ক্রটি, সেই লজ্জা আমাদের। এই সব সবল, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের নয়।

নেপালী ভাষা ছাড়া এরা যখন আর কোন ভাষা জানে না আপনার উচিত ছিল আমাদের নিয়োগ পত্র দেবার সময় এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা। তবে এই গুরু দায়িত্ব নিয়ে এই প্রবঞ্চনা করতে কখনই এতদূরে আসতাম না।

তাছাড়া এখানেই তো বহু শিক্ষিতা নেপালী বা স্থানীয় মেয়ে আছে—যারা নেপালী ভাষা জানে। কারণ তারা আজন্ম এখানকার বাসিন্দা। তাদের দিয়েই তো আপনার প্রতিষ্ঠান চালাতে পারতেন।

সতীর এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর সামুই দিতে পারেননি।

স্থানীয় লোকেরাও জানে, চেনে তাঁকে। তাঁর এই শিক্ষা ব্যবসার খবরা-খবরও তারা রাখে। তাই স্থানীয় কোন শিক্ষিতা মেয়ে বা শিক্ষিতা নেপালী শিক্ষিকা জেনে শুনে এই প্রতিষ্ঠানে চাকরী নেবে না। কারণ তারা জানে এই প্রতিষ্ঠানের চাকরীতে নিজের উন্নতি বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কখনই সম্ভব হবে না। অল্প দিনেই সতী উপলব্ধি করতে পারলো যথার্থ শিক্ষা দান অপেক্ষ

ছাত্রছাত্রীদের থেকে দক্ষিণা আদায়ে সামুই বেশী তৎপর। শিক্ষার নামে চলেছে প্রহসন বা হীন ব্যবসা।

মোটা অঙ্কের টাকা ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ফী বাবদ দিচ্ছে। অথচ তাদের শিক্ষা দানের কোন পদ্ধতি নেই কোন পাঠ্য সূচী বা ক্যারিকুলাম। নেই কোন বোর্ডের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন। এবং কারো কোন অনুমোদন নেবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই সামুইর।

কারণ কারো অনুমোদন নিতে হলে নিয়ম শৃঙ্খলার নাগ পাশে আবদ্ধ হতে হবে। সামুইর খেয়াল খুসী মত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে পারবে না। প্রতি পদক্ষেপই তাঁকে বোর্ডের আইনের ধারায় পড়তে হবে। যথেচ্ছাচারের কোন অবকাশ তাতে থাকবে না।

এই শিক্ষা কেন্দ্র ওরফে ব্যবসা ক্ষেত্র তাঁর এজমালী সম্পত্তি। মুনাফা লুটছেন তিনি সপরিবারে। তাই এর মধ্যে যেমন ম্যানেজিং কমিটি বলে কিছু ঢুকতে দিয়ে—প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অপরের হাতে দিতে তিনি রাজী নন। তেমনি বোর্ডের অনুমোদন নিতে গিয়ে নিজের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে, এক চেটিয়া মুনাফা হারাতেও তিনি রাজী নন।

বাইরের শিক্ষিকাও নিয়োগের তেমন প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন না। নেহাৎ ২।১টি শিক্ষিকা না থাকলে পুরোপুরি পারিবারিক ব্যাপার বলে ছাত্রছাত্রীরা বা তাদের অভিভাবকরা সন্দেহ করবে, তাই দুই আদর্শবতী সরলা শিক্ষিকাকে সুদূর বাংলার বুক হ'তে মিথ্যে আদর্শের জাল ফেলে টেনে এনেছেন।

আদর্শের গগেল্‌স্ পরে সতা ও মনীষা ছুটে এসে ছিল সামুইর শিক্ষা কেন্দ্রে। তাঁর আদর্শের লম্বা চিঠিতে ভুলে তাদের কর্ম জীবনের এই প্রথম পদক্ষেপ। তাদের সর্বোত ভাবে আশাহত হতে হয়েছে।

কিন্তু ফাঁকির জালে তারা জড়িয়ে থাকেনি। সতী আসবার কয়েক দিনের মধ্যেই শিক্ষার ব্যবসা হতে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য উভয়েই পদত্যাগ পত্র দিল।

কিন্তু বুদ্ধিমান সামুই এত সহজে মুক্তি তাদের দিলেন না। বে-আইনী প্রতিষ্ঠানে আইনের নজীর দেখিয়ে জানালেন পূরো একটি মাসের পূর্বে তাদের মুক্তি নেই।

মুক্তি তাদের দিয়ে ছিলেন ভগবান। তাঁর লীলার মাধ্যমেই সামুই রূপ সাক্ষাৎ বিপদোন্মুক্ত হয়ে ছিল সতী ও মনীষা।

মুক্তির জন্য সতী ও মনীষা মন প্রাণ উন্মুখ হয়ে উঠেছে, সামুইর শিক্ষার হাটে বিক্রেতা সেজে বসতে তাদের বিবেক দংশন করছিল। স্বল্প দিনেই তাঁর প্লেইন লিভিং হাই থিংকিং এর সার মর্ম উদ্ধার করে ফেলেছে সতী ও মনীষা। তাই তাঁর এই অভিনব ব্যবসার নতুন কৌশলের মুখোস ও খুলে পড়ল সতী ও মনীষার সামনে।

সামুই ভেবেছিলেন প্রথম চাকরীর উন্মাদনায় যারা এতদূর ছুটে এসেছে-- তাদের তাঁর ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফা লুটবেন তিনি। হোক্ না শিক্ষা দানে ভেজাল। তবু তাঁর আয়ের পথ তো সুগম। একটি মাস যদি এই দুই শিক্ষিকাকে ধরে রাখা যায় তবে বুঝতে হবে—এরা টিকে যাবে।

অলক্ষ্যে বুঝি হেসেছিলেন বিধাতা পুরুষ সামুইর কূট ব্যবসার চক্রান্ত দেখে ও হতভাগী দুই সরলা যুবতীর আশাহত মনের অবস্থা দেখে।

এইভাবে দিনের পর দিন শিক্ষার নামে প্রতারণা করতে সতীর বিবেক বিদ্রোহ করছিল। এদিকে দিন যতই যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এই দুই শিক্ষিকার মধ্যে একটা আন্তরিক যোগাযোগ ঘটছিল। ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা এঁরা পেয়েছে দিয়েছে দুই করপুটে এদের স্নেহ। অলক্ষ্যে এদেরই মায়ার জালে যেন এরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

নবীন বয়সের সেন্টিমেন্ট। হয়ত হৃদ্যতা উভয় পক্ষ হতে আরও প্রগাঢ় হয়ে পড়লে এদের বাঁধন ছিন্ন করে যাওয়া সম্ভব হত না।

এতে নিজেদের লোকসানকে মূলধন করেই হয়ত আদর্শের নেশায় সামুইর আরও মুনাফা লুটবার সুযোগ ঘটত্।

এই সব সরল বালক বালিকা কিশোর কিশোরীরা রোজই নিয়ে আসে নানা বর্ণে গন্ধে রাঙ্গা পুষ্প বা পুষ্পস্তবক—সতী ও মনীষার জন্য। তাদের সরল প্রাণের ভালবাসার অর্ঘ্য স্বরূপ সহাস্যে তাই দিয়ে আনন্দ পায়। এই দেওয়া নেওয়ার মধ্যে যে পরস্পরের মনের যোগাযোগ—তাই প্রকাশ পায়।

কোন প্রকারে সতী ও মনীষার কোন কাজে সহায়তা করতে পারলে ব. কাজ করে দিতে পারলে এরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করে।

কিন্তু সতী ও মনীষার মন ক্রমেই মুষড়ে পড়ছে এই ভেবে-এই সব দরিদ্র অবোধ সরল ছাত্রছাত্রীদের প্রতারণা করতে সহায়তা করছে তারা। প্রতি মুহূর্তে সতী ভগবানকে ডেকে বলেছে—মুক্তি দাও এই প্রবঞ্চনা হতে। রক্ষা কর এই সব সরল ছাত্রছাত্রীকে সামুইর লালসার বহ্নি হতে।

একটি মাস সতীর কাছে যেন একটি যুগ মনে হল। কিন্তু বিধাতার অমোঘ নির্দ্দেশে এক ঘেয়ে জীবনের অবসান হল।

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। সতী ও মনীষা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে গল্প করছিল। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ। পাহাড়ের গা বেঁয়ে কুল্‌কুল্ রবে বয়ে চলেছে বৃষ্টির ধারা। জানালা দিয়ে প্রকৃতির সেই অপূর্ব শ্রী দেখছিল সতী।

প্রকৃতির এই রমনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে কোনও রুদ্র রূপ থাকতে পারে, তা সতীর ধারণাতীত ছিল। মনীষা বসে আত্মীয় স্বজনকে চিঠি লিখছিল।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সতীকে আকর্ষণ করেছিল। তাই চিঠির ঝাঁপি না খুলে সে নিবিষ্ট মনে দেখছিল প্রকৃতিকে। মনে তার আনাগোনা করছিল অনেক স্মৃতি।

এমন সময় সামুইর একমাত্র হেলপিং হ্যাণ্ড পাহাড়ী ভৃত্য মায়েলা

ভীত কম্পিত স্বরের—পইরো—পইরো—শব্দ সতীর ধ্যানস্থ মনকে সচকিত করল।

সতী ও মনীষা ছুটে যেয়ে দেখল তাদের রান্না ঘরের নীচের মাটিটা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বসে গেছে। কাঠের রান্না ঘরটি যেন শূন্যে ঝুলছে। অনভিজ্ঞ এই যুবতীদ্বয় অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল রান্না ঘরের নিম্নাংশের ভূমি খণ্ড ঢলের বিশাল ঢেউ এর স্রোতে ভেসে গিয়ে সমুদ্রবক্ষে যেন আপন ছোট্ট একটা স্থান করে নেবার জন্য স্খলিত ঢলের সঙ্গে বিরাট শব্দে গড়িয়ে পড়ছে।

চোখের পলকে কি ভাবে রান্না ঘরটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে মাটি ধ্বসে মিশে গেল ঢলের সঙ্গে তা আশ্চর্য্য জনক।

সামুই সমূহ বিপদের সম্ভাবনায় ছুটে গেলেন নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে এক বস্ত্রে সঙ্গে কেবল ছাতা, বর্ষাতি ও গরম ওভারকোট নিয়ে। সর্বস্ব ত্যাগ করে সতীদেরও এই পরিবারের অনুগমন করতে হল।

পথে যেতে যেতে সতীরা প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবিই সর্বত্র দেখলো। মহাকাল যেন তালে তালে ভৈরব নৃত্য সুরু করেছে। অবিরত ধারায় বৃষ্টি, ঝড় ও সঙ্গে সঙ্গে গুম্ গুম্ শব্দ। আকাশ বাতাস ভেদ করে মর্মভেদী শোঁ। শোঁ আওয়াজ।

পথে যেতে যেতে অনেক ভগ্নোন্মুখ গৃহের দুরাবস্থা ও বাসিন্দাদের আর্ত্ত স্বর শোনা গেল। পাহারী অঞ্চলের বেশীর ভাগ বাড়ী কাঠের। তাই কিছু বাড়ীকে শূন্যে ঝুলতে দেখা গেল। কিছু বাড়ী তাসের ঘরের মত ভেসে চলেছে মহাকালের স্রোতে।

এমন কি কনক্রীটের শক্ত মজবুত নতুন একটা বাড়ীও সর্বস্ব তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ে কোথায় মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

তিন চারদিন বিনিদ্র রজনী, গৃহ হতে গৃহান্তরে সতীরা আশ্রয়ের জন্য ছুটে চলেছে। যেই গৃহই নিরাপদ মনে করে বিপদগ্রস্ত অধিবাসীরা আশ্রয় নিয়েছে পরক্ষণেই দেখা গেছে—সে গৃহও প্রকৃতির রুদ্র রোষ হতে অব্যাহতি পায়নি।

আহার নেই। নিদ্রা নেই। এক বস্ত্রে সকলে পাগলের মত দুর্য্যোগ মাথায় করে ছুটে চলেছে। জলের পাইপ ভেঙ্গে পড়েছে। সহরে জল সরবরাহ বন্ধ হয়েছে। কলে এক ফোঁটা জল নেই। বৈদ্যুতিক তার ছিন্ন ভিন্ন করে সমস্ত সহর অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। কোথাও কোথাও পথও নিশ্চিহ্ন। দোকান পাট বাজার সব বন্ধ।

সকলের মুখে ভীত চকিত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। প্রকৃতির হাতে মানুষ কত অসহায় সেদিন সতী তার জীবনে প্রথম উপলব্ধি করল।

অপরিচিত গৃহে এক বস্ত্রে অপরিচিত বহু পরিবারের সমাবেশ হয়েছে। ক্ষুধার্ত শিশুদের ক্রন্দনের রোল, সর্বস্ব রিক্ত জনের করুণ বিলাপ কারও কারও মূক দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল ত্রাস জনিত ভীতির চিহ্ন।

চারিদিক হতে কেবল মহা দুর্যোগের সংহারলীলা সংঘটনের গুরু গম্ভীর বজ্রনাদ আকাশে বাতাসে ভেসে আসছিল

বাঙ্গালীর অতিথিপরায়ণ স্বভাব। তাই গৃহস্বামীর ভাণ্ডারে যে স্বল্প আহার্য্য বস্তু ছিল—তিনি তাই সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

সহরবাসীকে সতর্ক করে দেবার জন্য পুলিশ লাউড স্পীকার যোগে চীৎকার করছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই ভীষণ গর্জন ভেদ করে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

অন্ধকারের কুহেলিকা ভেদ করে ভোরের আলো ফুটে উঠল। মানুষের চোখের সামনেও প্রকৃতির তাণ্ডব লীলার ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠল। সবার মুখে এক কথা—কোথায় যাবো, নিরাপদ স্থান কোথায় ?

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মানুষ এক আশ্রয় হতে অন্য আশ্রয়ে ছুটে ছুটে চলেছে এক বস্ত্রে। মানুষ কত দুর্বল কত অসহায়, প্রকৃতির ক্রোড়ে। মানুষ তার হাতে ক্রীড়ণক স্বরূপ। মানুষের বিশাল শক্তি প্রকৃতির নিকট উপহাস মাত্র।

সেদিন সতীর মনে হয়েছিল চণ্ডীদাসের—মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান—এ বাণী কত ভুল। প্রকৃতির ক্রোড়ে মানুষ কত তুচ্ছ কত দূর্বল, কত অসহায়।

কিভাবে যে একাদিক্রমে দূর্যোগময়ী তিনটি রজনী অতিবাহিত হল—তা স্বপ্নের মতই মনে হয়েছে সতীর কাছে। তিন রাত্রি পরে তাদের আশ্রয় মিলে ছিল পাব্লিক হলে।

আহার্য বস্তু ছিল পোড়া খিচুড়ি। তিন দিন অভুক্ত থাকার পর ঐ পোড়া খিচুড়িকেই সকলে পরমান্ন জ্ঞানে নিঃশেষ করেছিল।

এই তিন দিনের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সতী নুয়ে পড়েছে। ছোট খাট কত রকম অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছে। ঝড়ের মুখে তারা নীড়হারা পাখীর মত স্থান হতে স্থানান্তরে আশ্রয়ের জন্য ছুটেছে।

একই কক্ষে হয়ত আশ্রয় মিলেছে বাঙ্গালী, নেপালী, ভুটিয়া সবাই। ভুটিয়া ও নেপালী নারী পুরুষের নির্বিশেষ ধূমপানের গন্ধে ঘরের আবহাওয়া ক্রমে দূষিত হয়ে উঠত। তারই মধ্যে হয়ত একদল কয়লার উনোন জ্বালিয়ে শরীর গরম করছে, পরিধেয় বস্ত্র শুকাচ্ছে।

ধূমপানের ধোঁয়া ও গন্ধ তার সঙ্গে কয়লার ধোঁয়ায় সতীর মাথা ধরে যেতো। এরই মধ্যে হয়ত কোন কোন শিশু বা বৃদ্ধ বৃদ্ধা শারীরিক অসুস্থতার দরুণ ঐ ঘরেই বমি করছে। কেউ কেউ ঘরেই থু থু ফেলছে। এক দিকে সবার সিক্ত বস্ত্রের জলের ধারা। অন্য দিকে শিশুদের মূত্রের ধারা। সব মিলিয়ে যা সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃত নরক কি সতী তা জানে না। হয়ত একেই নরক বলে।

প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি শান্ত হল তিন দিন পর। আস্তে আস্তে সকলেই নিরাপদ আপন আপন গৃহে বা অন্য কোন গৃহে নতুন করে সংসার করতে উঠে গেল। সরকারী কাজও দ্রুত সুরু হতে লাগল।

এই ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যেও কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস। পরিত্যক্ত অনেক গৃহে জীবন বিপন্ন করে ভুটিয়ারা ঢুকে যথা সর্বস্ব চুরি

করে নিয়ে গিয়ে গৃহীকে সর্বসান্ত করেছে। সাময়িক কালের জন্য হয়ত দারিদ্র্যের জ্বালা হতে মুক্তি পেয়েছে তারা।

কত জন প্রকৃতির ভীষণ রুদ্র মূর্তির সম্মুখীন হতে যেয়ে সংজ্ঞা হারিয়েছে মুহুর্মুহুঃ। কত জন হারিয়েছে প্রিয় জনদের। প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথায় অধীর হয়ে ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ছে কতজন।

কোথাও শিশু একা বেঁচে রয়েছে—পরিবারের সবাই ঘর চাপা পড়ে নিঃশেষ হয়েছে। এমনি ধারা নানা করুণ খবর ভেসে আসছে।

এরই মধ্যে প্রেমের লীলাও কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করেছে সতী। মনীষা একটি কিশোরী ও দু'টি বালিকার সঙ্গে আলাপ করছে দেখে—সতীও সেখানে গিয়ে বসলো।

মনীষা কিশোরীকে জিজ্ঞেস করল—বিমলা, তোমার বাবা কোথায়? তাঁকে দেখছি না যে!

—তিনি আসেননি। আমাদের এখানে থাকতে বলে তিনি চলে গেছেন বাসায় ফিরে, কারণ বাড়ীতে সরকারী অনেক প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র আছে—যদি চুরি যায় তবে খুব ক্ষতি হবে—উত্তর দিল বিমলা।

—তোমাদের ঝি মনোরমাকেও তো দেখছি না? সে-ই বা কোথায় গেল? তোমরা তিনজন এখানে একা রয়েছো।

বালিকা অমলা বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে উত্তর দিল—সে আবার কোথায় থাকবে! যেখানে বাবা থাকেন, সেখানেই সে থাকে। বাবা তাকেও এখানে এসে থাকতে বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে। উত্তরে সে কি বললে জানেন?

—আপনি যেখানে থাকবেন, আমিও সেইখানেই থাকবো, বিপদের মুখে আপনাকে ফেলে আমি যেতে পারব না।

ছোট্ট কমলা কমলার মতই টুকটুকে রং ও সুন্দর মুখ। সে আধো আধো ভাষায় বলল—মনোরমাটা সব সময় বাপিকে আগলে থাকে। আমি একটুও বাপির সঙ্গে গল্প করতে পারি না। রাত্রে

বাপির সঙ্গে গল্প করব বলে রোজ আমি তার বিছনায় শুয়ে থাকি, বাপি এত দেরী করে আসে যে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে উঠে দেখি আমি দিদি মেজদির ঘরে তাদের সঙ্গে শুয়ে আছি।

মনোরমাটার জন্য একটি দিনও আমি বাপির কাছে শুতে পারি না। রোজ রোজ সে একা বাপির ঘরে শোয়।

সরলা শিশুর মনের দুঃখ প্রকাশ হয়ে পড়ে সহানুভূতির পরশে।

মনীষা শিশুর অভিযোগের উত্তর খুঁজে পায় না। কিশোরী বিমলাই নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে—সত্যি মনীষাদি, আমাদের একটুও ভাল লাগে না।

বাবার প্রশ্রয়ে মনোরমার ঔদ্ধত্য দিন দিন বেড়ে চলেছে! এখন তো সে আমাদের দেখাশোনা করা দূরে থাক্—কমলারও যত্ন করে না বা দেখা শোনা করে না। কমলার সব কিছুই আমাকে করতে হয়।

নিজে সব সময় পটের বিবির মত সেজে গুজে চাকরদের উপর মাতব্বরী করে বেড়ায়। নতুবা বাবার অবসর সময় তাঁর সঙ্গে গল্প গুজব করে কাটায়।

যদি কিছু বলি—বাবার কাছে নালিশ করে আমাদের গাল শোনায়। নতুবা নিজেই বলে—বড় হয়েছো দুদিন পরে শ্বশুর বাড়ী যাবে · কাজ কর্ম শিখে নাও।

বাবাকে যদি তার আচরণের জন্য নালিশ করি, তবে বাবা বলেন—কি করব বল? ওকে তোমাদের সয়ে নিতে হবে। তোমাদের মা মারা যাবার পর হতে মনোরমা এত বছর তোমাদের মানুষ করেছে।

বিপদের দিনে সে তোমাদের জন্য এত করেছে, আজ তোমরা বড় হয়েছো বলে তো তাকে ফেলে দিতে পারি না। তা অমানুষের মত কাজ হবে।

বিমলা বলল—আমরা উত্তরে বলি—বেশ তো সে দেশে তার আপন জনের কাছে চলে যাক্। তুমি মাঝে মাঝে তাকে মাসোহারা

পাঠিয়ে দিও। তবে তার প্রতিও তোমার কর্তব্য করা হবে, সেও বঞ্চিতা হবে না।

কিন্তু বাবা আমাদের প্রস্তাবে রাজী নন। মনে হয় বাবা বোধ হয় তার জন্য আমাদেরও ছাড়তে পারেন।

অমলা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল—মনোরমার কাজ হচ্ছে এখন অষ্ট প্রহর সেজে গুজে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করে আমাদের বিরুদ্ধে বাবার কান ভারী করা।

ছল্ ছল্ চোখে ছোট্ট কমলা বলে—মনোরমা ভারী দুষ্টু। বাপি আগে আমাকে কত আদর করত। কত ভালবাসতো। এখন কিছু করে না। যদি বা বাপি আমায় আদর করতে আসে, মনোরমা বলে—হয়েছে হয়েছে অত বড় মেয়ে নিয়ে আর সোহাগ করে কাজ নেই।

সরলা মাতৃহীনা ফুট্‌ফুটে ফুলের মত সুন্দর মেয়ে তিনটির জন্য সতীর ভারী খারাপ লাগলো। মনীষার থেকে সে জানতে পারলো বিমলাদের বাবা কোন এক ষ্টেটের ম্যানেজার। কমলাকে বছর খানেকের রেখে তাদের মা মারা যান্। তারপর হতে মনোরমা কর্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিতা হয়ে—এই তিনটি মেয়ের জীবন দূর্বিসহ করে তুলেছে। এই নীচ জাতিয়ার ছলাকলার জালে ক্রমেই ভদ্রলোক জড়িয়ে পড়ছেন। এ যেন অন্ধ প্রেমের নাগপাশে ধরা পড়া।

সম্ভ্রান্ত ঘরের, সুশিক্ষিত, পদস্থ ব্যক্তির কি রুচি! সমাজের পরিণতি কোথায়? সন্তানদের সামনে বাপের কি আদর্শ!

এই ধরণের নানা রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল সতী। ভাগ্যবান সামুই তাঁর পরিত্যক্ত গৃহ হতে যখন অন্য গৃহে অবস্থানের জন্য স্থানান্তরিত হবার জন্য পরিত্যক্ত জিনিষ পত্র আনতে গেলেন, দেখলেন একটি ছুঁচও কেউ স্পর্শ করেনি। পরিত্যক্ত গৃহের তাঁর সব জিনিষই—এমন কি টাকা পয়সা পর্যন্ত সবই ঠিক আছে।

প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি দিনই গড়িয়ে গেল। তারপর নতুন বাড়ীতে ঠিকভাবে বসবাস করতে যেয়ে

আরও বেশ কয়েকটা দিন পাহাড়ীয়া ধ্বসের মত ধ্বসে গেল সতীদের অলক্ষ্যে তা তারা বুঝতেই পারেনি।

এই বিপর্যয়ের মধ্যেও সামুইর ছাত্রছাত্রীরা স্থান হতে স্থানান্তরে ছুটে ছুটে এসে খবরাখবর নিয়েছে কোথায় তাদের শিক্ষা-গুরুরা অবস্থান করছেন এবং কি পরিবেশের মধ্যে। তাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে এই বিপদের মধ্যে তারা সামুইকে সর্বোতভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছে।

তাদের এই অকৃত্রিম সাহায্য বিপদের সম্মুখে আপন জনের মত হাত বাড়িয়ে সাহায্য করা—সব কিছু মিলিয়েই সরল পাহাড়ীদের মনের নিবীড় স্নেহ প্রীতির স্পর্শ অনুভব করা যায়।

মাসান্তে দেখা গেল এত হাড় ভাঙ্গুনী খাটুনীর পর প্রতিশ্রুত দক্ষিণা বা পারিশ্রমিক যা সতীদের দেবার ছিল—তার দুই তৃতীয়াংশ সতী ও মনীষার খোরাকি বাবদ কেটে নিয়েছে সামুই। কিন্তু অভুক্ত দুই শিক্ষিকাকে নিজেদের পয়সায় খাবার কিনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে হয়েছে।

যদিও সতীরা স্থানীয় অন্যান্য আবাসিক মেয়েদের স্কুলের শিক্ষিকাদের খোরাকি খরচ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জেনেছে যে, যে অঙ্কের টাকা তাদের থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে, তার এক তৃতীয়াংশ দিয়েই অন্যান্য স্কুল হোষ্টেলের শিক্ষিকাদের পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়।

সামুইর সততার অনেক উদাহরণই সতীদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে একে একে। তাঁর শিক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ করবার আগে সতী ও মনীষাকে দিয়ে তিনি একটি খাতায় তাদের প্রাপ্য মাইনার তিন গুণ অঙ্ক প্রাপ্তি সই করে রাখলেন আয়কর ফাঁকি দেবার জন্যে। কৈফিয়ৎ দিলেন ঐ অঙ্কটাই তাদের খোরাকী বাবদ কেটে নেওয়া হয়েছে।

সতী ও মনীষা উভয়েই ভাঙ্গা মন নিয়ে শৈল শিখর হতে অবতরণ করল, যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করবার জন্য উন্মাদ হয়ে

তারা ছুটে গিয়েছিল উত্তর বাংলার রম্যভূমি শৈল চূড়ায়, তথায় তারা অবস্থান করেছিল বটে, কিন্তু না পেরেছিল সৌন্দর্য ভোগ করতে না পেয়েছিল চাকরীর আনন্দ।

নচিকেতা সামুইর শিক্ষার হাটের বিক্রেতা সেজে বসতে তাদের বিবেক দংশন করেছিল। কিন্তু সরল পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে হাট ভেঙ্গে দিতেও তাদের মনে দুঃখ হচ্ছিল।

কিন্তু সামুইর শিক্ষারূপ ব্যবসার মূলধন স্বরূপ সতীরা থাকতে রাজী হয়নি। তাদের অন্তর বিদ্রোহ করেছিল। সতী মনীষা উভয়েই নিরাশ অন্তরে ক্ষত বিক্ষত মনে ফিরেছিল।

একদিকে বিবেক বিসর্জন দিয়ে অর্থোপার্জনের কি ঘৃণ্য দৃশ্য! অন্য দিকে সরল মানুষের এ কালের সভ্যতার আলোর জন্য কি আকুল আগ্রহ।

২

সতীর অধ্যাপনা জীবনে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু মেদিনীপুরের মায়াকানন উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত এবং বোর্ডের অনুমোদিত এই প্রতিষ্ঠান কালের কোলে অনেক বছর অতিক্রম করেছে।

আবাসিক শিক্ষিকার সংখ্যাই বেশী। স্থানীয়ের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অগণিত ছাত্রী যেমন, তেমনি সংখ্যা শিক্ষিকার।

বিরাট বিরাট সুন্দর বিদ্যালয় দালান। প্রধান শিক্ষিকার কোয়ার্টার ও শিক্ষিকাদের হোষ্টেল।

পরিবেশটাও ভারী সুন্দর। একদিকে বাঁধানো বিরাট দীঘি। অন্য দিকে মেয়েদের খেলার জন্য বড় মাঠ। সামনে বাগানটি কেবল নানা রঙের ও নানা বর্ণের ফুলের সম্পদে নয়, বিন্যাসের পারিপাট্যে সকলের মন আকৃষ্ট করে।

দুরন্ত হাওয়া উন্মত্ত হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে চারিদিকের গাছপালাকে ব্যস্ত বিব্রত করে। সতীর মনে পড়ল পূর্ব বাংলার সেই জেলাকে যেখানে প্রত্যেক দিঘীর নাম সাগর। কারণ আয়তনে এত বড় যে সাগর বললে কোন অত্যুক্তি হয় না। তার উপর স্বচ্ছ জলের ঢেউ নেচে বেড়ায় দিঘীর বুকের উপর।

সতীর বিশেষ করে মনে পড়ে একটি দীঘির কাহিনী। কারণ এ দীঘির সঙ্গে এক অকৃত্রিম মাতৃভক্তির কথা যুক্ত আছে।

কোন এক ব্যক্তি অতি দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ তার ভাগ্যের দুয়ার খুলে গেল এবং অচিরে বহু টাকার মালিক হলো।

তবে যে সময়কার কথা বলছি তখন টাকার রঙ কালো ছিল না।

তখন টাকা রোজগার করত সকলে বুদ্ধি ও অধ্যবসায় দিয়ে। আজকালকার মত টাকা আকাশ ভেঙ্গে আসতো না বা জোয়ারের জলের মত আসতো না।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করা হতো। অতএব ঐ রকম টাকার উপর মালিকের আকর্ষণও থাকতো। কারণ কষ্টের রোজগার।

অভাব অনটনের সংসারে পুত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। কেবল স্বচ্ছলতাই নয়। ধনের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে।

একদিন বৃদ্ধা মা বললেন—"বাবা, তোর তো অনেক টাকা হয়েছে ভগবান ও পূর্বপুরুষের আশীর্বাদে। আমার বড় সাধ দেশের ও দশের উপকারের জন্য কিছু কাজ কর্।

পুত্র মাকে প্রশ্ন করল—মা, তোমার কি ইচ্ছে বল?

মা উত্তর দিলেন—আমাদের গ্রামে কোন দীঘি বা নদী নেই। তুই একটা দীঘি তৈরী করে দে। যাতে গ্রামের লোকের কি শীতে কি গ্রীষ্মে জলের কোন অভাব না হয়।

ছেলে বলল—মা, তুমি একবারে যতটুকু পথ হাঁটতে পারবে আমি ঐ রকম লম্বা একটা দীঘি কেটে দেবো।

ছেলের কথা মত মাইলের প্রায় এক চতুর্থাংশ মা হেঁটে গেলেন। ছেলেও ঐ জায়গায় একটা দীঘি কেটে দিল।

সতী ভাবে কোথায় সে সব দিন! কোথায় সে মাতৃভক্তি, কোথায় সে পিতৃভক্তি! সতীর যুগের ছেলেরা পিতামাতাকে ঐভাবে ভক্তি করে না। আবার ঐশ্বর্যেরও ব্যবহার এই যুগে অন্য ধরণের। পরহিতার্থে অর্থ ব্যয়—অর্থে এ যুগে অপব্যয়। অর্থ কেবল এ যুগে আত্মভোগ বিলাসের জন্য।

মফঃস্বলের এই বিদ্যালয়ে দরখাস্ত পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সতী

নিয়োগ পত্র পেয়ে গেল। সতীও নির্দিষ্ট দিনে রওনা হবার তারিখ ও সময় জানিয়ে প্রধানা শিক্ষিকার পত্রোত্তর দিল।

কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ তার পক্ষে সেই দিন রওনা হওয়া সম্ভব হলো না। তাই সতী দ্বিতীয় একটি চিঠিতে নির্দিষ্ট দিনে না যাবার কারণ জানিয়ে কবে যাবে জানতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই চিঠির প্রত্যুত্তর সে পায়নি।

মাস কয়েক পরে আবার ঐ স্কুলের ঐ একই পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেখে সতী আবার দরখাস্ত করল। এবার কিন্তু তাকে ইণ্টারভিউর জন্য ডেকে পাঠানো হল।

নির্দিষ্ট দিনে সতী ইণ্টারভিউ দিতে হাজির হল। নতুন করে নিয়োগ পত্র হাতে করেই ফিরে এল। নামকোয়াস্তে ইণ্টারভিউ। সতীর মনে হল এই প্রহসনের কি কোন প্রয়োজন ছিল? তাই মৌখিক পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর সতী প্রধানা শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করল,—

—একটি প্রশ্ন বারবার আমার মনে জাগছে। আশা করি সেই প্রশ্নের জবাব আমি পাবো। কৌতূহল হচ্ছে জানতে প্রথমবার ইণ্টারভিউ ছাড়াই আপনারা চাকরীতে আমাকে নিয়োগ পত্র পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু দ্বিতীয়বার কেন ইণ্টারভিউ এর জন্য ডাকলেন? ইণ্টারভিউ এর গুরুত্ব তো কিছুই উপলব্ধি করতে পারছি না।

প্রধানা শিক্ষিকা আরতিদি সহকারী প্রধানা শিক্ষিকা মানসীদির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—এই কয়মাসে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে—যা আমার দীর্ঘ ৩৫ বছর অধ্যাপনা জীবনে ছিল না।

তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছো কয়েক মাস আগে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম—তাতে আরও কয়েকজন শিক্ষিকার জন্য বিজ্ঞাপন

ছিল। সার্টিফিকেটের কপি, অভিজ্ঞতা ও গুণাবলী দরখাস্ত পড়েই সেই সব বিষয়ের শিক্ষিকাদেরও নিয়োগ পত্র পাঠালাম।

প্রথম যে টীচার আসলেন তার নাম সুব্রতা সোম। কথাবার্তায় সে ভালই। ক্লাশে পড়াতো খুবই ভাল। কয়েকদিনেই তার পড়ানোর গুণে ছাত্রীরা তার সুখ্যাতিতে মুখর।

কিন্তু কয়েকদিন পরই সুব্রতার হাবভাব যেন অদ্ভুত মনে হল। অর্থাৎ অপ্রকৃতস্থতার লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল। ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে। ক্লাশেও যায় না। কারো সাথে কোন কথা বলে না। কেন এমন আচরণ করছে—তাও জানা গেল না তার থেকে শত চেষ্টা করেও।

অগত্যা ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হল। ডাক্তার দেখে বললেন, —এঁর বাড়ীতে খবর পাঠান। ইনি প্রকৃতস্থ নন। মনে হয় রোগটা তাঁর পুরানো।

নতুন পরিবেশে হয়ত অতীতকে ভুলে ইনি ছিলেন—তাই কয়েকটা দিন প্রকৃতস্থ ছিলেন। নতুন পরিচয় পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অতীতের স্মৃতি মন্থন করতে যেয়েই আবার যে সূত্রে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল—সেই হেতুটা নতুন করে আলোড়িত হয়েছে মনে। যার পরিণামে আবার পুরাণো ব্যাধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সুব্রতার বাড়ীতে খবর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে লোক এল তাকে নিয়ে যেতে। সুব্রতার দাদা এসেছিলেন। তিনি বললেন।

—সুব্রতা আমাদের না জানিয়েই এখানে এসেছে। আমি অফিসে চলে গিয়েছি। ছোট ভাই বোনেরা স্কুল কলেজে চলে গেছে, সেই সুযোগে দুপুরে কাউকে না জানিয়ে সে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে।

আসার সময় বাড়ীতে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছিল - দাদা, আমার জন্য চিন্তা কর না। চাকরী নিয়ে আমি অন্যত্র যাচ্ছি।

সময়ে ঠিকানা ও অন্যান্য খবর দেব। তোমার একার উপর এতবড় সংসারের দায়িত্ব আমার ভাল লাগে না। তাই চললাম।

আত্মীয় স্বজন তার বন্ধু বান্ধব সবার কাছেই খোঁজ নিয়ে কোথাও তার ঠিকানা এ কটা দিন পাইনি।

সুব্রতা খুবই ভাল ছাত্রী, হয়ত তা তার সার্টিফিকেট হতেই দেখেছেন এবং শিক্ষিকা হিসাবেও তার খুবই সুনাম।

হঠাৎ পূর্ব বাংলার দাঙ্গায় আমাদের পরিবারের উপর দিয়ে যেমন ঝড় বয়ে গেল, তেমনি সুব্রতার জীবনেও নেবে এল এক অভিশাপ।

দাঙ্গায় মুসলীনদের হাতে প্রাণ দিলেন আমাদের বৃদ্ধ পিতা। সুব্রতাকেও তারা লুঠ করল। অবশ্য আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মুসলীমই খোঁজ করে সুব্রতাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে ফিরিয়ে এনে দেয়। অন্যান্য ভাই বোনেরা ছিল ছোট ছোট। আমাদের মা আগেই গত হয়েছেন।

তারপর আমরা এখানে চলে আসি। সুব্রতাকে যদিও ফিরিয়ে পেয়েছি। কিন্তু প্রকৃতস্থ অবস্থায় নয়। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। মাঝে মাঝে সে বেশ স্বাভাবিক থাকে। মাঝে মাঝেই এমনি ধারা অপ্রকৃতস্থতার লক্ষণ দেখা যায়। এ ছাড়া অন্য কোন উপদ্রব সে করে না।

বিশেষ করে দাঙ্গা হাঙ্গামার আলোচনা তার সামনে করলেই তার অভিশপ্ত অতীত স্মৃতির দংশনে তার স্বাভাবিক অবস্থা লোপ পায়।

সুব্রতার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের কেনাকেটা সবই শেষ। কিন্তু সেই শুভ লগ্ন আসবার কয়েকটা দিন আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটে যার জন্য সমস্ত জীবনটাই তার কাছে অভিশপ্ত হয়ে উঠল।

সুব্রতাকে একটি কথায় বলা যায় পরমাসুন্দরী। এমন সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না। কথাবার্তা, আচার ব্যবহারেও বোঝা যায়—সে উচ্চ বংশের মেয়ে।

ভগবান বোধ হয় নিখুঁত কিছুই রাখেন না। তাই সুব্রতার জীবনে অপ্রত্যাশিত অভিশাপ নেবে এল।

সুব্রতার জীবনেতিহাস শুনে সত্যি খুবই দুঃখ হয়েছিল। সুব্রতাকে রক্ষা করতে যেয়েই প্রাণ হারিয়েছিলেন বৃদ্ধ পিতা। দাদা তখন বাড়ী ছিলেন না। সুব্রতা ছিল সায়েন্স টীচার।

তারপব এল কেকা দাম। সে ইতিহাসের শিক্ষিকা। সার্টিফিকেট বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। সে-ও দিন পনের বেশ স্বাভাবিক ভাবে ক্লাশ নিলো।

তারও পড়ানোর কায়দা এত সুন্দর যে অল্প দিনেই ছাত্রীরা তার অনুগত হয়ে পড়ল। সবাই কেকাদির পড়ানোতে খুসী।

সেদিন স্কুলের কি একটা উৎসবে ভোজেব আয়োজন ছিল, সব শিক্ষিকারা এক সাথে খেতে বসেছি। কেকাও বসেছে। সারাদিন সে বেশ ছুটোছুটি করে কাজ করছিল।

কিন্তু যেই মাত্র তার পাতে লেডিকেনী দেওয়া হল, অমনি তার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বিষ-বিষ বলে চীৎকার করে সে পাতের থেকে উঠে গেল।

আমরা সবাই তার সামনে লেডীকেনি খেয়ে দেখালাম বিষ নয়। কিন্তু তারপর হতে তাকে আর জলস্পর্শও করানো সম্ভব হয়নি।

আবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হল। আবার তিনি এসে জানালেন কেকার এটাও পুরাণো ব্যাধি। নিশ্চয় আগেও এ রোগ ছিল। সাময়িক ভাবে হয়ত ভাল হয়ে উঠেছিল। হয়ত ঐ বিশেষ খাদ্যের সঙ্গে জড়িত কোন স্মৃতিই তার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ।

কেকার বিয়ে হয়েছিল সৎ শাশুড়ীর সংসারে। বিয়ের পব শ্বশুর বাড়ীতে সবাই তার প্রশংসায় মুখর। তা সহ্য করতে না পেরে সৎ শাশুড়ী তাকে বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল।

অবশ্য বহু কষ্টে প্রাণে বেঁচে গেলেও—ঐ আঘাতটা তার মনে

গভীর দাগ কেটে ছিল। তাই ঐ খাবারটা দেখলেই তার অপ্রকৃতস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়।

এসব খবর কেকাকে নিতে এসে কেকার ছোট বোন জানিয়ে ছিল। কেকাও বাড়ীতে না জানিয়েই সবার অজ্ঞাতে এই চাকরীতে এসেছিল। সে বাসায় বলে এসেছিল—সে তার স্বামীর কাছে যাচ্ছে।

তাই বাড়ীর কারোর মনে কোন সন্দেহ হয়নি। কারণ মাঝে মাঝে সুস্থ হলে সে স্বামীর বাড়ীতে যায়। অবশ্য ঐ ঘটনার পর হতে কেকার স্বামী আর সৎ মার সঙ্গে একই ছাদের নীচে বসবাস করতে সাহস পায়নি। কেকার ছোট বোনটিও শিক্ষিকা।

কত ক্ষুদ্র কারণে মানুষের জীবনে কি বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই দুটি মেয়ে জীবনের কতটা পথই বা এগিয়েছে। এরই মধ্যে তাদের জীবনের সব সাধ আহ্লাদ শেষ হয়ে গেছে। জীবনটা তাদের কাছে বিড়ম্বনা মাত্র। আত্মীয় স্বজনের কাছেও তারা আজ অবাঞ্ছিতা।

এইসব কারণেই তোমার দ্বিতীয়বার ইণ্টারভিউর প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম। যদিও জানি এই ইণ্টারভিউর কোনই সার্থকতা নেই। কারণ সুব্রতা ও কেকাকে দেখে তো কেউ-ই বুঝতে পারেনি যে তারা প্রকৃতস্থ নয়। যখন তারা স্বাভাবিক ছিল তখন তো তারা তোমার আমার মতই ভাল ছিল।

সতী নির্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে কর্ম স্থলে গেল। অভিজ্ঞা আরতিদির তত্ত্বাবধানে সবই সুপরিচালিত হচ্ছিল! কিন্তু তবু শান্তি ছিল না ঐ প্রতিষ্ঠানে।

স্কুলে দুটি দল ছিল। এক প্রবীণা ও অন্য নবীনার দল। প্রবীণার দলে আরতিদি, মানসীদি এবং আরও ২।১ জন—যাঁরা অভিজ্ঞতার অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন।

নবীনার দল সমালোচনায় মুখর। তারা আইনকে বে-আইন করতেই যেন বেশী তৎপর। আরতিদির একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায় শিশু বিদ্যাপীঠ বর্তমানের মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

তাই স্থানীয় সব অভিভাবকই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা সব দিক দিয়েই তাঁর সজাগ দৃষ্টি। সমস্ত জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন এই শিক্ষা মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করতে।

সতী খুসী হয়েছিল আরতিদি ও মানসীদিকে দেখে। এদের মধ্যেই যেন সতী খুঁজে পেলো তার অতীত দিনের আদর্শ শিক্ষিকাদের। অন্যান্য প্রবীণা যে ২।১ জন ছিলেন - তাঁরা স্থানীয়া। কেউ বা বিধবা, কেউ বা সধবা।

কিন্তু আরতিদি ও মানসীদি এর ব্যতিক্রম। কুমারী জীবন তাঁরা উৎসর্গ করেছেন এই বিদ্যালয়ের এক একটি ফুল ফুটাতে। আচারে, ব্যবহারে তাঁদের সৌম্য গাম্ভীর্য আর্কষণ করে সবাইকে।

সতী যখন মায়াকানন বিদ্যালয়ে চাকরী নিয়ে আসে, তখন সেই একমাত্র এম, এ, বি, টি। আরতিদি, মানসীদি এঁরা তাঁদের দীর্ঘকালের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার জোরেই বোর্ডের নব প্রণীত আইন হতে অব্যাহতি পেয়ে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিতা আছেন।

নবীনা যারা—তারা সদ্য কলেজ হতে এসেই এখানে ঢুকেছে। এখানে এসেই ডেপুটেশনে অনেকে বি, টি পাশ করেছে। কেউ বা প্রাইভেটে অনার্স দিয়েছে। কিন্তু তখনও এম, এ কেউ হয়নি। অবশ্য কেউ কেউ প্রাইভেটে এম, এ দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল।

যে দুজন এম, এ, বি, টি শিক্ষিকা নব নিযুক্ত হয়েছিলেন, তারা তো মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য নামে মাত্রই এসেছিলেন।

সতী নবীনা দলভুক্ত ঠিক নয়। তাই হোষ্টেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্বন্ধে প্রবীণা নবীনা সকলেরই ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গী ছিল।

স্কুল হতে ফিরে বাঁধানো দীঘির ঘাটে বসে নবীনার দলের আড্ডা

চলতো। বিষয় বস্তু প্রধানা ও সহ-প্রধানার সমালোচনা, তাঁদের প্রতি কাজে ত্রুটি খুঁজে বেড়ান।

জয়শ্রী অঙ্কের শিক্ষিকা। আরতিদি তাকে সর্ট কোর্সের সাইকোলজির টেষ্ট পড়িয়ে এনেছেন। এর দ্বারা নবম শ্রেণীতে উঠলে-ছাত্রীদের এপ্‌টিটিউড্‌ টেষ্টের মাধ্যমে, কে কোন শাখায় পড়বে বা পড়া উচিত তার পরীক্ষা করে নির্দ্দিষ্ট কোর্সে তাকে পড়তে অনুমতি দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে এই বিশেষ পদ্ধতিটা এতকাল চালু না থাকায় অভিভাবকরা নিজের খেয়াল খুসী মত সন্তানদের যে কোন একটা কোর্স পড়াতেন। ফলে সেই বিশেষ বিষয়ে তার দক্ষতা না থাকার জন্য বার বার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার গ্লানিতে ছাত্রটি আত্ম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

সতীর্থরা সকলেই উন্নতির উচ্চতর সোপানে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। আর সে কিনা সাটেল কর্কের মত বার বার ফিরে আসছে। এর থেকেই তার মধ্যে জন্মে হীনমন্যতা, অনেক ক্ষেত্রে পরিণামে সে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। তার মধ্যে দেখা দেয় অপরাধ প্রবণতা।

ছাত্রের অঙ্কের মেধা নেই। তবু অভিভাবকদের ইচ্ছা সে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনীয়ার হোক্‌।

ছাত্রের বাইওলজিতে বিন্দু মাত্র আগ্রহ নেই—তবু তাকে সেই বিশেষ বিষয় পড়তে হচ্ছে। কারণ অভিভাবকের ইচ্ছে ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হোক্‌।

যে ছাত্রের নতুন কিছু উদ্ভাবনা করবার মেধা আছে, বা যার মধ্যে পার্থিব নানা অনুসন্ধিৎসা আছে—তাকে বলা হয় সাহিত্য নিয়ে পড়তে-যাতে ভবিষ্যতে সে সাহিত্যের অধ্যাপক হতে পারে। পরিণামে কোনটাই শুভ হয় না।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাউকে চালাতে গেলেই সে বিদ্রোহ করবেই।

অথচ এতকাল আমাদের দেশের সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের কাঠামো তৈরী হত অভিভাবকদের খেয়াল খুসী মত।

ফলে উপযুক্ত জমিতে উপযুক্ত বীজ রোপণ না করায় সুফল পাওয়া যেতো না। কৃষিরা যেমন বিশেষ কোন ফসল ফলাবার জন্য উপযুক্ত ঋতুতে উপযুক্ত জমিতে তার বীজ বপন করে থাকে, তেমনি শিক্ষক মণ্ডলীরও কর্তব্য উপযুক্ত মেধার ছাত্রকে, উপযুক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে সহায়তা করা।

এতে ব্যক্তি, পরিবার, দেশ, জাতি সবারই উপকার করা হয়। উপযুক্ত ছাত্র, উপযুক্ত সন্তান, উপযুক্ত নাগরিক হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতির সহায়ক হয়ে থাকে।

কিন্তু দূরদর্শিতার অভাব, সন্তানের যোগ্যতার মাপমাঠি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকায় অভিভাবকরা প্রায়ই সন্তানদের ভুল পথে চালিত করে, পরিবারের, দেশের ও সমাজের ক্ষতি করে থাকেন।

সন্তান দেশের উপযুক্ত নাগরিক না হয়ে নিজের জীবনের গ্লানিতে অবগাহন করে—অপরাধপ্রবণ নাগরিক বা অকৃতকার্য জীবনের ক্লেদ বয়ে বেড়ায়।

তাই বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশগুলির শিক্ষা পদ্ধতির ধারা অনুসারে আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষালয়ে ছাত্রদের দক্ষতার পরিমাপের উপর তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কাঠামো তৈরী করতে দেওয়া হয়।

জয়শ্রী রেফিউজি। বৃদ্ধ রুগ্ন বেকার অনেকগুলি ভাই বোনের দায়িত্বের কিয়দংশ জয়শ্রীর। বিশেষ কোন ডিপ্লোমা বা সর্ট কোর্সের ট্রেণিং থাকলে—স্কুল আইনানুসারে বেতনের উপর উপরি কিছু ভাতার ব্যবস্থা আছে।

বিশেষ করে এই কারণেই আরতিদি জয়শ্রীকেই সাইকোলজির এই সর্ট কোর্সটা নিতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর এই উদারতার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ জয়শ্রীই ছিল নবীনাবৃন্দের দলপতি।

জয়শ্রী একদিন সতীকে নবীনাদলের মধ্যে পেয়ে বলল—জানেন

সতীদি, আরতিদি মনে করেন আমরাও বুঝি তাঁর ছাত্রীদলভুক্ত। তাই আমাদের গতিবিধি তিনি যেমন নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনি আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁর নির্দেশ মত চলতে হবে। কি অন্যায় বলুন তো।

স্মিত হাস্যে সতী উত্তর দেয়—তোমাদের সব কিছুর উপরেই যে তাঁর স্কুলের সুনাম নির্ভর করে। তোমাদের উপরই নির্ভর করছে স্কুলের ভালমন্দ। তাই রাশ যদি সময়ে টেনে না ধরেন—তবে যে তা বন্ধছাড়া অশ্বের মত যত্রতত্র ছুটে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ কালের সুনাম নষ্ট করবে।

জয়শ্রী উষ্মা প্রকাশ করে উত্তর দেয়—কেন আমরা কি শিশু? নিজেদের ভালমন্দ কি নিজেরা বুঝি না? স্কুল কলেজে থাকতে অভিভাবকরা বা কলেজের সুপার আমাদের এসব বিষয়ে তত্ত্বাবধান করতেন।

কিন্তু আজ কেন? আজ তো আমরা স্বাবালিকা হয়েছি। আজ আমাদের শাসন করবার কোন অধিকার তাঁর নেই। ওঁনার না হয় জীবনের শেষ হয়ে গেছে। তাই আমোদ আহ্লাদ বলে কিছু নেই। কিন্তু আমাদের জীবনের সবে সুরু। সবে আমরা বিকশিত হচ্ছি। এখন যদি এভাবে আমাদের কঠিন শাসনের নিগড় শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয় তবে আমাদের মন কেন বিদ্রোহ করবে না—বলুন?

সতী শান্ত সুরে উত্তর দিল—আমাদের থেকে তাঁর অনেক বেশী অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরেই তিনি আমাদের খাঁটি করে তৈরী করতে চান।

আদর্শ শিক্ষিকা যদি হতে চাই, তবে তাঁর উপর আমাদের ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। তিনি আমাদের প্রত্যেকের ভালর জন্যই তো এভাবে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

পরন্তু আজকাল শিক্ষিকা জীবনের যে স্খলন ঘটেছে, আরতিদি যদি আগের থেকেই সতর্ক হতে চান্—তাতে তাঁকে দোষারোপ করা যায় না।

ভূগোলের শিক্ষিকা কাজল পাত্র। রং তার আবলুস্ কাঠের মত কাল। গায় কিন্তু চমৎকার। সহকর্মীদের আড়ালে আরতিদিকে সে যথেষ্ট ফ্ল্যাটারী করে থাকে। এবং তাঁর সব রকম আদেশও শিরোধার্য করে। কারণ একবার তার খুবই খারাপ টাইফয়েড হয়। আরতিদিই তার সব চিকিৎসার খরচ দিয়ে তাকে সুস্থই শুধু করেননি পরন্তু কয়েক দিনের জন্য পুরীতে চেঞ্জে পাঠিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়ে এনেছিলেন।

মানুষ মাত্রেরই উপকৃত ব্যক্তির প্রতি একটা কমপ্লেকসিটি জন্মায়। তাই আরতিদির এই উদারতা ও সহৃদয়তার প্রতি কৃতঘ্নতা বশতঃ সে সহকর্মীদের সমক্ষে আরতিদির কার্যকলাপের সমালোচনায় মুখর।

কাজল বলে—আমাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেই উনি কেবল খুসী নন। আমাদের পোষাকের উপরও তাঁর রেস্ট্রিক্‌স্‌ন্।

আরতিদি না হয় তিন কাল যেয়ে এক কালে ঠেকেছেন। তাই কোন সাধ আহ্লাদের আর প্রয়োজন নেই। ছুবেলা ঘণ্টা নেড়ে এবং গায়ত্রী জপ করার সময় হয়েছে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালনও করেন।

যার যা ধর্ম তাকে তা করতে দেওয়াই উচিত। আমাদের সবে জীবনের কলি ফুটেছে। কোথায় এখন আমরা নানা বর্ণে গন্ধে নিজেদের সাজাবো, তা নয় এমন ধারা গলা, বুক, পেট, হাত কাটা জামা পরা চলবে না। বেশী চাকচিক্যের শাড়ী পরা চলবে না। সিল্ক শাড়ী পরা চলবে না। কত আইন!

এবার আমাদেরও দেখছি লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বলতে হবে— এত জুলুমবাজী চলবে না। আমাদের দাবী মানতে হবে। আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ চলবে না।

সংস্কৃতের শিক্ষিকা ভৈরবী চাক্‌লাদারকে আরতিদিই ডেপুটেশনে বি. টি. পড়িয়ে এনেছেন। বিধবা মার সংসারের দায় দায়িত্ব ভৈরবীর

উপর। তাই আরতিদি তাকে চাকরীর উন্নতির সহায়তা করতে যতটা সম্ভব সবই করেছেন।

ভৈরবী বলে—আরতিদি আমাদের ভিক্টোরিয়ান ডলের মত সাজিয়ে রাখতে চান্। আমরা যেন মেশিন ফিট্ করা মানুষ। তাঁর হুকুমে তাঁর নির্দেশ মত কাজকর্ম করব। তারপর সব চুপচাপ বসে থাকবো।

কখনও যদি একটু জোরে কথা বা হাসা হয়—অমনি তিনি ছুট্তে ছুট্তে এসে বলেন—ছিঃ, ছিঃ তোমরা সব শিক্ষিকা। সংযম শিক্ষা করনি। তোমাদের এ ধরণের উচ্ছ্বাস কি শোভা পায়? ছাত্রীরা বা তাদের অভিভাবকরা শুনলে কি বলবে? আনন্দ কর, স্ফুর্তি কর,—কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যেও না।

আমরা যেন সব ছোট ছোট মেয়ে। তাই আমাদের প্রাণের উচ্ছ্বাসের মাত্রা তাঁরই নির্দেশে প্রকাশ করতে হবে। এতটা ডিকটেটার বোধ হয় হিট্লারও ছিল না। অসহ্য! অসহ্য এই ঔদ্ধত্য!

ইন্দিরা পালুই ইতিহাসের শিক্ষিকা। এই স্কুলে চাকরী নেওয়ার পরে আরতিদির উৎসাহে ও সহযোগীতায় সে প্রাইভেট অনার্স পড়ে পাশ করেছে। ইন্দিরার পড়ার বই বেশীর ভাগ আরতিদিই জোগাড় করে বা কিনে দিয়েছেন।

কারণ মফঃস্বল শহরে তো তেমন লাইব্রেরী নেই, যেখানে যেয়ে নোট করে পড়াশুনা করতে পারা যায়। গরীবের মেয়ে। তাই স্বাবলম্বিনী হবার যথা সম্ভব সুযোগ আরতিদিই করে দিয়েছেন।

প্রথম যখন সে এই স্কুলে চাকরী নিয়ে এসেছিল, পোষাকে আচারে ব্যবহারে একেবারেই গেঁয়ো ছিল। স্কুল ফ্যাইন্যাল পাশ করার পর হতে গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা করেছে এবং প্রাইভেট বি, এ, পাশ করে এসেছিল।

সেই সরলা গ্রাম্য ইন্দিরা পালুইকে আজ আধুনিকা শহুরে

ইন্দিরার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পোষাকে চলনে বলনে নেই আজ সেদিনের গ্রাম্য জড়তা, চাউনীতে নেই সলজ্জ বিনম্রভাব, ভীত সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ আর নেই। গ্রাম্য জীবনের সব নিদর্শন আজ ইন্দিরার জীবন হতে কোথায় হারিয়ে গেছে।

এ যেন ছাঁচে ঢালা এক নতুন মেয়ে। সব কিছু নিয়ে তাকে আজ অতি আধুনিকা বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আরতিদির ভয়ে তার এই নব কলেবর তেমনভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে আরতিদির উপর তার এ হেন আক্রোশ।

ইন্দিরা সুন্দরী বটে। মাজা ঘসা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ঢলঢলে মুখ। প্রতিমার মত অতি নিখুঁত মুখশ্রী। ঘনকৃষ্ণ বড় বড় চোখের পাতার আড়ালে টানা টানা চোখ, তুলি দিয়ে টানা ভ্রূদ্বয়, বাঁশীর মত নাক। এক রাশ ঘন কাল কোকড়ানো চুলের গুচ্ছ পীঠের উপর ঢেউ তুলেছে।

ঠোঁটে মুখে হাল্কা করে একটু প্রলেপ বুলিয়ে দিলে যে কোন জন-সমাগমের মধ্যে সে সকলকে আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু আজন্মের সব রকম সংস্কার কাটিয়ে সে নতুন সাজে ফুটে উঠেছে। আরও উগ্র পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করে জনতার সামনে নিজেকে নিবেদন করতে চায়। কিন্তু তার সেই বাসনা কামনার অন্তরায় আজ আরতিদি। যিনি তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষিণী। তাঁকেই সে আজ বড় প্রতিবন্ধক বলে ভুল করছে।

ক্ষুব্ধ ইন্দিরা পিঞ্জরা বদ্ধ পশুর মত সময় সময় গর্জে উঠে। যে কোন প্রকারে আরতিদিকে আক্রমণ করলেই যেন তার প্রাণের জ্বালা মিটে। সে বলে—মানসীদি এক নম্বরের বোকা। মালটি-পারপাস স্কুলের এইচ, এম আরতিদি। কিন্তু গাধার খাটুনি খেটে মরছেন মানসীদি।

রুটিং করা, কোন্ টীচার অনুপস্থিত তার ক্লাশ অন্য কোন টীচারকে

দিতে হবে, স্কুলের যাবতীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা, নোটিশ লেখা—সব কিছুই মানসীদির কাজ।

আরতিদি কেবল সই করেই কর্তব্য শেষ করেন। অথচ মোটা মাইনা তো পান আরতিদি। মানসীদির তো সামান্য একটা এলাউন্স মাত্র সহকারী প্রধানা হিসাবে। সত্যিই মানসীদি এক নম্বরের বোকা। আমি হলে কখনও অত খাটতাম না অন্যের সাহায্যের জন্য।

টিপ্পুনি কাটে সুচরিতা সেন আর্ট টীচার। সুচরিতাও রেফিউজি মেয়ে। স্কুল ফ্যাইন্যাল পাশ করে আরতিদির স্কুলের প্রাইমারী বিভাগে একটা চাকরীব জন্য এসেছিল।

সুচরিতার হাতের কাজ খুবই সুন্দর। সুতরাং আরতিদিই তাকে নানা রকম স্কলারশিপ্ জোগার করে দিয়ে হোম সায়েন্স কলেজ হ'তে হাতের কাজে পাশ করিয়ে আসতে সহায়তা করেছিলেন। সুচরিতা পাশ করে আসবার পর তিনিই তাকে তাঁর স্কুলের হায়ার সেকেণ্ডারী কোর্সের আর্ট টীচার নিয়োগ করলেন।

সে এসেছিল প্রাইমারী স্কুলের সামান্য একটা সহকারী শিক্ষিকার প্রত্যাশায়—সেইখানে একেবারে ডবল প্রমোশন পেয়ে মালটিপারপাস স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা হয়ে গেল। মান মর্যাদা অর্থ সব কিছুই তার আশাতিরিক্ত হয়েছে। তাই নিজেকে সে-ও একজন কেউ কেটা মনে করে।

সুচরিতা টিপ্পুনী কেটে বলে—বাঃ তোমার যেমন বুদ্ধি ইন্দিরা! আরতিদি হলেন প্রধানা শিক্ষিকা। আর মানসীদি হলেন সহকারী প্রধানা। কত পার্থক্য উভয়ের মান, সম্ভ্রম, বেতনে।

যে যত উচ্চ পদে বসবে—কাজ তার তত হাল্কা। দেখছ না আমরা সবাই মিলে এই মায়াকানন বিদ্যালয় রূপ বাগানটি সাজাচ্ছি। কিন্তু যত কৃতিত্ব সব আরতিদির। কারণ তিনি হলেন এই বাগিচার মালাকার!

যুদ্ধ করে সৈন্যরা। যুদ্ধে মরে সৈন্যরা। জয়-ও করে সৈন্যরা। কিন্তু জয়ের মালা সেনাপতির গলায় পড়ে। পুরস্কৃত হয় সেনাপতি। কৃতিত্ব সব সেনাপতির। তেমনি আরতিদিও আমাদের অধিনায়িকা।

অফিসের কোরানীরা ঘাড় গুঁজে দশটা পাঁচটা একটানা কাজ চালাচ্ছে। অফিসের যিনি বড় সাহেব বেতন তার মোটা। কিন্তু কাজ তার কেবল চোখ বন্ধ করে দৈনন্দিন কিছু সই দেওয়া অথবা পি, এ অথবা ষ্টেনোকে ২।১টা ডিক্‌টেশন দেওয়া।

তেমনি আরতিদিও তো আমাদের স্কুলের বড় সাহেব। দিনান্তে ২।১টা ক্লাশ নেন্ ও সই করেন সারাদিন। আর দর্শনার্থীদের সঙ্গে আলাপ করেন।

আগে এইচ এম হবার উপযুক্ত হও। তারপর ঐ পদকে ঈর্ষ্যা কর। আমরা যখন সেই কপাল করে আসিনি, দৈনিক পাঁচটির পরিবর্তে সাতটি করে ক্লাশ নিয়ে গলায় রক্ত তুলব—কিন্তু প্রধানার সমালোচনা কদাপি নৈব নৈব চ।

বাল-বিধবা সুধীরা বসু বিজ্ঞানের শিক্ষিকা। সে বলে—সতীদি। আপনার যদি উচ্চ পদস্থ বিবাহযোগ্য কোন ছোট ভাই বা ভাইপো বা বোনপো থাকে, তবে কিন্তু আরতিদির কাছে আপনার খুব আদর হবে।

কারণ আইবুড়ো পিসীর গলগ্রহ একপাল ভাইঝি। অবশ্য গল-গ্রহ এদের ঠিক বলা যায় না। কারণ আরতিদির ভাইরাও বড় বড় চাকরী করে। কিন্তু ভাই বা ভ্রাতৃজায়া অপেক্ষা পিসীরই দুশ্চিন্তা কাল কাল ভাইঝিদের দায় উদ্ধারের।

অবশ্য ভাইঝিরা তাঁর সবাই শিক্ষিতা, গায়িকা, আধুনিকা, তবু বেইমান পাত্রপক্ষরা মাজা ঘসা রং নয় বলে পরোক্ষে পণের যে ফর্দ দেয়—তা শুনে ভাইঝিরা সব সত্যাগ্রহ করেছে।

বিনা পণে যে করিবে না পাণি গ্রহণ, দিবো না তারে বরমাল্য।

তাই পিসীর হয়েছে মাথা ব্যথা ভাইঝিদের পাত্রস্থ করবার জন্যে।

এই সুধীরাও কিন্তু আরতিদির ঋণ শোধ করতে বন্ধুদের মত কোন অংশে পরাঙ্মুখ নয়। কারণ আরতিদি যখন এই স্কুলের চাকরীর দায়িত্ব নিয়ে আসেন, তখন একদিন নিপীড়িতা বধূ ভ্রাতৃগৃহে নির্যাতিতা ভগ্নী সুধীরা এসে কেঁদে পড়ল আরতিদির কাছে। বাল-বিধবার করুণ নির্যাতনের কাহিনী শুনে দুঃখে কাতর হয়ে তিনি তাকে তাঁরই স্কুলে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ করে দিলেন, পরন্তু তার বই খাতা পত্রর খরচও আরতিদিই কাঁধে নিলেন।

তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে বিধবা সুধীরা আজ স্বাবলম্বিনী। সে আজ অনার্স গ্র্যাজুয়েট। আরতিদিই তাকে আগামী বছর ডেপুটেশনে বি টি পড়তে পাঠাবেন।

আজ সুধীরা কাউকে পরোয়া করে না। পরন্তু শ্বশুরকুল, পিতৃকুল উভয় কুলেই সুধীরার আজ পরম সমাদর। সবাই আজ তাকে সাদরে ডাকে। সবাই তাকে কাছে পেতে চায়।

কারণ নিঃসন্তান সুধীরার আয়ের অংশ কিছু খসাবার মতলব সবাই রাখে। তাই যে শ্বশুর কূলে সে ছিল এতদিন অলুক্ষণে বৌ-আজ তাদের কাছে সে পয়মন্ত বধূ, আদর্শ বধূ।

যে ভ্রাতৃজায়ার সংসারে সে দাসী বাঁদীর মত সারা দিনরাত খেটেও পেট ভরে একবেলা খেতে পায়নি, আজ সে গৃহে সুধীরার মত আদর্শ বুদ্ধিমতী সহৃদয়া ননদ হয় না। এমন ভগ্নী নাকি দুলর্ভ। সেই গৃহে এখন প্রায়ই তার চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সহকারে নেমন্তন্নের ডাক আসে।

রূপার টাকা আজ আর নেই। কাগজের টাকার ভারসাম্য রক্ষা করতে উভয় কূলে আজ সুধীরাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি।

কিন্তু যাঁর উদারতায় ও সহৃদয়তায় সুধীরা আজ সর্বত্র সমাদৃতা তাঁকে সমাদর করবার সৌজন্যতা বা কৃতজ্ঞতা সুধীরার নেই।

উৎপলা বাঘ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষিকা। মস্ত পরিবার, বৃদ্ধ রুগ্ন পিতা। উপযুক্ত ভাই মৃত। কিন্তু ভাই এর সংসারও টানতে হচ্ছে উৎপলাদের। চাকরীর বাজার বড়ই মন্দা। বিশেষ করে অনার্স বা এম, এ, বি, টি না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরী পাওয়া দুষ্কর।

উৎপলা, নির্মলা দুই বোনই এসেছিল আরতিদির কাছে। তাদের জীবন বৃত্তান্ত ও পারিবারিক ইতিহাস শুনে তিনি দুই বোনকেই কেবল চাকরীই দিলেন না, উভয়কে স্পেশাল অনার্স পড়ালেন। বি, টি, পড়ালেন ডেপুটেশনে। নির্মলাকে প্রাইভেট এম, এ-ও পাশ করালেন।

তারপর তিনিই নির্মলাকে সহরতলীর একটা নতুন স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার পদে চাকরীর সুযোগ ঘটিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। কারণ এর দ্বারা উৎপলাদের সংসারে আর্থিক অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হবে।

কিন্তু সেই উৎপলাই একদিন বলল—যেহেতু আরতিদি এম, এ নন্—সেকালের গ্র্যাজুয়েট, তাই তিনি তাঁর থেকে বেশী শিক্ষিতা কোন শিক্ষিকাকে সহ্য করতে পারেন না। তাই তো নির্মলাকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন।

সতী উত্তর দিয়েছিল—তা কেন হবে? আমিই তো এম, এ, উনি তবে আমাকে কেন নিয়োগ করলেন?

উৎপলা উত্তর দিল—এখন বোর্ডের নিয়মে এম, এ না হলে নতুন নিয়োগ পত্র দেওয়া চলবে না, তাই ত আপনার স্থান হল এইখানে। কিন্তু নির্মলাকে তো সহ্য করতে পারলেন না বলেই সরিয়ে দিলেন।

নীচ হীন অন্তরের লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাই সতী উৎপলার এই কৃতঘ্নতার জবাব দিতে যেয়েও নীরব রইল। সে জানতো নির্মলাকে এই চাকরী দিয়ে আরতিদি একটা পরিবারের কতটা সাহায্য করছেন। কিন্তু মানুষ এতই কৃতঘ্ন যে তার স্বীকৃতি

দিতেও তার প্রাণ চায় না। প্রতিদিনই আরতিদি ও মানসীদির প্রতি কৃতঘ্নতার পরিচায়ক এই ধরণের নানা সমালোচনা তাঁদের সহকর্মীরা করে থাকে। এ ধরনের সমালোচনার কোন হেতু নেই।

মানবজাতি আজ অতি ছোট ও হীন হচ্ছে। হিংসা, দ্বেষ, অকৃতজ্ঞতা মানুষের বুক জুড়ে আছে। এ কারণে মহত্ত্বের পূজা করতে তাদের মন প্রাণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

সহকর্মীদের এ ধরনের হীন আচরণে ও নোংরা আলাপ আলোচনায় সতী আঘাত পায়। এই স্কুলের আবহাওয়া আরতিদির মহান্ আদর্শের পরিপন্থী দেখে সতী আরতিদির জন্য ব্যথা বোধ করে।

কিন্তু এদের এই নোংরা স্বভাবের প্রতিবাদ করা এবং তপ্ত লোহায় হাত দেওয়ার পরিণাম একই। তাই এসব শিক্ষিতা শিক্ষিকদের সমালোচনা সতী দুই কানে শুনেই যায়।

প্রথম প্রথম তাদের এই সব সমালোচনার প্রতিবাদ করতে যেয়ে সে বুঝেছে এতে তার শত্রু সংখ্যাই বাড়ছে। এদের স্বভাবের কখনও পরিবর্তন হবে না।

সতীর ভাল লাগেনি এই পরিবেশ। কোন সুস্থ আলাপ আলোচনা এদের মধ্যে নেই। এদের আলোচনা শুনলে কেউ মনে করতে পারে না এরা সব শিক্ষিতা শিক্ষিকা।

হয় আরতিদি মানসীদির সমালোচনা নতুবা সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে আলাপ আলোচনা। অথবা কে কার সঙ্গে প্রেম করছে। কার প্রেমিক কি রকম ইত্যাদি যত আজে বাজে আলাপ আলোচনা অথবা কোন ছাত্রী কোন টীচারকে কি প্রেজেন্ট দিল।

শিক্ষিকারা ছাত্রীদের থেকে কোন রকম উপহার গ্রহণ করে এটা এই স্কুলেই প্রথম সতী দেখলো। শুধু তাই নয়। বিশেষ বিশেষ শিক্ষিকার বিশেষ বিশেষ ছাত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

এখানে ছাত্রী শিক্ষিকার সম্পর্কটাও যেন তেমন পবিত্র নয়। মেয়েরা জানে বিশেষ দিদির ক্লাসে বিশেষ একটি মেয়ের সব অপরাধ মার্জনীয় অথবা সে-ই বেশী নম্বর পাবে।

সেই ছাত্রী সেই দিদিকে রোজ নানা ফুলের স্তবক এবং হাতের তৈরী ব্যাগ, ফুলদানী ইত্যাদি নানা রকম উপহার দিয়ে থাকে।

এই যে বিশেষ একটি ছাত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব এটা আরতিদি পছন্দ করেন না। তাঁর মতে শিক্ষিকারা ছাত্রীদের সকলকেই সমানভাবে দেখবে, সমানভাবে স্নেহ করবে, ভালবাসবে, শাসন করবে। তাদের থেকে কোন রকম উপহার শিক্ষিকাদের গ্রহণ করা উচিত নয়।

এতে অন্যান্য ছাত্রীদের সেই বিশেষ শিক্ষিকার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে না। এর দ্বারা শিক্ষিকারাও ছাত্রীদের সমালোচনার বস্তু হয়ে পড়ে। নিজেদের ব্যক্তিত্ব শিক্ষিকারা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় হয়ত নিজেদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছে সে সম্বন্ধেও ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে। ফলে ছাত্রীরাও শিক্ষিকাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে ওয়াকিবহাল হয়।

ফলে ছাত্রীরাও শিক্ষিকাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে। শিক্ষিকাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা তারা হারিয়ে ফেলে। সর্বদা শিক্ষিকাদের ত্রুটি অনুসন্ধানে তৎপর হয়।

আরতিদির সারা মন জুড়ে ছিল কিভাবে প্রতিটি ছাত্রীকে আদর্শ শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার One gcod mother is worth a hundred school masters

কখনও বা বলতেন দেশের সুনাগরিক গড়বার দায়িত্ব তো আমাদেরই হাতে। অন্ততঃ আমার একটি স্কুলের ছাত্রীরাও যদি সুশিক্ষা পেয়ে যায়—তবে তাদের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ হবে।

তোমরা সর্বদা মনে রেখো—It is the duty of woman to

bring up children and the children of to-day are the citizens of to-morrow. The character of a child is made or marred by the capacity or incapacity of the mother.

স্কুলটি ছিল আরতিদির সারা জীবনের ধ্যান। আর ছাত্রীরা তাঁর প্রাণ। আরতিদিকে যথার্থই আদর্শ শিক্ষিকা বলা যায়। কিন্তু আরতিদির সহকর্মীরা তাঁর মনের খবর রাখে না। শিক্ষকতা তাদের ব্রত নয়--একটি পেশা মাত্র। সহকর্মীদের আচরণ সতীর পবিত্র মনে এক নির্মম ধাক্কা দিল।

সতী নবীনা শিক্ষিকাদের দলভুক্ত না হওয়ায় অবশেষে তার পিছনেও তারা লাগলো। নানা ভাবে তাকে টিট্‌কারী দিত, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত। তাদের ধারণা সতী বুঝি তাদের আলাপ আলোচনার কথা আরতিদিকে জানিয়ে দেয়।

তাঁর পিছনে তাঁর সমালোচনা করলেও, তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে এরা মুষড়ে পড়ে। এটাই চিরন্তন রীতি। ধার্মিকের সামনে অধার্মিকের মাথা আপনা হতে নুয়ে আসে। সতী কোন পক্ষর কাছেই নিজেকে প্রকাশ করত না।

সে নবীনাদের এই হীন মনোভাবের খবর আরতিদিকে কখন জানাতো না। কারণ এতে তিনি আঘাত পাবেন। এই সব নোংরা মনোবৃত্তির সান্নিধ্যে থাকতে সে চায় না। শিক্ষাব্রতীর স্থান এ নয়।

তাই বাড়ীর কাছেই শহরতলীর এক সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে চাকরী নিয়ে সতী চলে গেল।

৩

পঞ্চানন উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গ্রামাঞ্চলে অদ্বিতীয় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। গ্রামেরই এক শিক্ষানুরাগী ভদ্রলোকের চেষ্টায় শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরই দেওয়া জমিতে আস্তে আস্তে শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ডাল পালা ছড়িয়ে আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

যে চারা গাছটির জমি ছিল এত নরম, মনে হত সামান্য ঝড়ে এই বুঝি পঞ্চানন শিশু বিদ্যালয় ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু বহু ঝড় ঝঞ্ঝা মাথায় করে ক্রমেই দেখা গেল-টিকে গেল বিদ্যালয়টি পঞ্চাননের মত পাঁচদিকে নিজেকে প্রসারিত করে।

জমি তার শক্ত হল। দুর্জনের হাত হতে একে বাঁচাবার জন্য শক্ত গাঁথুনী দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল এর চারিদিক। এতদিন বেওয়ারিশ ছাগল ও গরুর আক্রমণে যে চারা গাছের বৃদ্ধি কেবল ব্যাহত হচ্ছিল, সেই গাছ আপন সীমানার মধ্যে মনের আনন্দে হাত পা ছড়িয়ে যেন ক্রমবৃদ্ধির উর্দ্ধ মুখে ছুটে চলেছে।

কিন্তু প্রথম শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চানন বিদ্যালয় স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে নাই। তাই পরদেশীদের সে আকর্ষণও করতে পারে নাই।

গ্রামের চাষা, মুঠে, মজুর এদের সবার সহযোগীতার কৃপাবারি পঞ্চানন ক্রমে ক্রমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। তাই ভাল শিক্ষকের অভাবও ছিল। গ্রাম্য ছেলেরা তাদের স্বল্প বিদ্যার ঝুলি নিয়েই বিকিয়ে ছিল শিক্ষা।

তাদের জ্ঞানের স্বল্প পরিধির জন্য সুশিক্ষা দান হয়ত সম্ভব তখন হয়নি পঞ্চানন বিদ্যালয়ে, কিন্তু গ্রাম্য যুবকদের ঐকান্তিকতার প্রাচুর্য্যে

শিশু পঞ্চানন বিদ্যালয় খুঁড়িয়ে সুঁড়িয়ে দশম শ্রেণীতে যেয়ে ঠেকল। কিন্তু এবার? গ্রাম্য যুবকদের দুর্বল কাঁধে ভর করে তো পঞ্চানন বিদ্যালয়ের এগোনো আর সম্ভব নয়।

প্রয়োজন এবার অন্যের সহায়তায় উঠে দাঁড়াবার। গ্রাম্য লোকদের সহায়তায় পঞ্চানন বিদ্যালয় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাকে উন্নতির শেষ ধাপে ঠেলে নিয়ে যেতে হলে যে জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রয়োজন—তা আর গ্রামবাসীদের নেই। তাই যোগ্য শিক্ষকদের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হল।

সৌভাগ্যক্রমে একই সঙ্গে বেশ কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক পাওয়া গেল। তাঁরা কেউ এম, এ, বি, টি; কেউ কেউ ডবল এম, এ অথবা এম, এস, সি, বি, টি। এদের মধ্যে সতী অন্যতম।

শহরের স্কুলগুলিতে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের এত অভাব। অথচ দূর গ্রামাঞ্চলে এত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক দেখে আশে পাশের অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠে।

অবশ্য এই কৃতিত্ব পঞ্চানন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ভজহরি তলাপাত্রের। বিনয়ে তিনি বৈষ্ণবদেরও হার মানিয়েছেন। তদুপরি শিক্ষিত শিক্ষকদের আটকে রাখবার কলা কৌশলও কিছু কিছু তাঁর জানা ছিল।

তাই তিনি তাঁদের কেবল বোর্ডের অনুমোদিত বেতন দিয়েই কৃতার্থ করেননি—যা নাকি অনেক শহরাঞ্চল এমন কি খোদ কলকাতা শহরেও কোথাও কোথাও একত্রে পুরো মাইনেটা দেওয়া হয় না কিস্তিতে কিস্তিতে এই দক্ষিণা মেলে। ভজহরিবাবু গুরু দক্ষিণা কখনও বাকী রাখতেন না।

সেই ক্ষেত্রে তলাপাত্র মহাশয় এই বিদেশী কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকাকে একত্রে মাসিক বেতন দেবার ব্যবস্থা তো করলেনই, পরন্তু গ্রামাঞ্চল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাড়ী ভাড়া বাবদ ২৫৲ করে

একটা ভাতা দেবার ব্যবস্থা বোর্ড হতে করা হয়েছে, অবশ্য তাঁরা ঘর ভাড়া করে থাকলেই সেটা পাবার সুযোগ পাবেন।

কিন্তু ভজহরিবাবু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই এই পরদেশী শিক্ষকদের অবস্থানের জন্য কোয়ার্টার তৈরী করে দিলেন। এবং সকলের একত্রে খাওয়ার সুবিধার জন্য একজন পরিচারকেরও ব্যবস্থা করে দিলেন,—যে এই সব শিক্ষকদের মেসিং এর রান্নার কাজ করতো, একজন ঠিকে ঝি বাসন মেজে দিতো এবং অন্যান্য কাজ করে যেতো। এতে শিক্ষকদের খোরাকী খরচ স্বল্পই হবে। পরন্তু বাড়ী ভাড়া বাবদ প্রাপ্য ২৫৲ ও তাঁদের জমার খাতায় পড়তো। তদুপরি আরও কিছু উপরি রোজগারের সুবিধাও এদের করে দিয়ে ছিলেন।

গ্রামের যে সব সমৃদ্ধশালী অধিবাসী আছেন—ভজহরিবাবু তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটার হিসাবে এইসব উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক-দের নিয়োগ করতে পরামর্শ দিতেন।

ফলে শিক্ষকরা কেউ কেউ তাঁদের কোয়ার্টারেই টিউটোরিয়েল ক্লাশ খুলে বেশ মোটা টাকা আয়ের ব্যবস্থা করলেন, কেউ কেউ বা কয়েকটি মাত্র ছাত্র পড়িয়েই হাত খরচের টাকা বা খোরাকী খরচের টাকা পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু কেউ-ই বাড়ী বয়ে গিয়ে ছাত্র পড়াতেন না। ছাত্রদেরই শিক্ষকমশায়দের আবাস স্থলে আসতে হত।

এইটে-ই ছিল শহুরে শিক্ষকদের আভিজাত্যের অন্যতম পরিচায়ক। সপ্তাহান্তে বেশীর ভাগই ২।১ দিনের ছুটিতে কলকাতা, বর্দ্ধমান ইত্যাদি নানা শহরে যার যার বাড়ীতে ঘুরে আসতেন। তাই গ্রাম্য জীবনের একটানা এক ঘেয়েমি এঁরা ভোগ করতেন না।

পরন্তু শহরাঞ্চলে টিউশনির প্রতিযোগীতায় বেশীর ভাগকেই মার খেতে হয়। কারণ শহরে এত বেশী প্রতিযোগী যে তাদের সঙ্গে ঠিক তাল রেখে চলা সম্ভব নয়। বিশেষ শহরাঞ্চলে প্রতি দশ পায়ের মধ্যে পর পর টিউটোরিয়েল হোম খুলে বসায়—অভিভাবকরা যেমন

সুলভে গৃহ শিক্ষক নিয়োগের ঝামেলা হতে রেহাই পেয়েছেন, তেমনি গৃহ শিক্ষকদের অদৃষ্টে আর মুঠি মুঠি টিউশনি মেলে না।

তদুপরি শহরের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে—সকলেই পরিবারে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দিতে পারেন, যা শহরের স্কুলে চাকরী করে সম্ভব হত না।

এতজন শিক্ষক এক সঙ্গে বসবাস করায় খুব একটা খারাপও তাদের লাগে না। নিজেরা স্কুল প্রাঙ্গনে টেনিস, ব্যাড মিনটন্ খেলার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব আলাপ আলোচনা ভালই চলে।

স্কুলের রেডিওটাও সেক্রেটারী মশায় শিক্ষকদের মেসে রেখেছেন —তাঁদের আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার সব রকম সুযোগ সুবিধা করবার জন্যে!

এক কথায় পঞ্চানন বিদ্যালয়ের বহিরাগত উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকরা বহাল তবিয়তেই এই গাঁয়ে বাস করেন, ভজহরির ভজনায় এরা সবাই সন্তুষ্ট, তাই অল্প স্বল্প অসুবিধা যা আছে—তা তারা গায়ে মাখে না।

সতীর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, সে থাকে ঐ গাঁয়ের জুনিয়ার বেসিক স্কুলের একটি কোয়াটারে, সেই কোয়াটারের একটি কক্ষে থাকে বেসিক স্কুলের এক শিক্ষিকা, অন্য কক্ষে সতী।

সতী তার সহ বাসিন্দা নন্দর সঙ্গেই একত্রে খাবার ব্যবস্থা করেছিল। অবশ্য এ কারণে নন্দাকে তার ষ্ট্যাণ্ডাডের চেয়েও উপরে উঠতে হয়েছে।

কিন্তু এজন্য নন্দার খুব একটা আপশোষ বা আক্ষেপের কারণ ছিল না। কারণ নন্দা জমিদারের ঘরের মেয়ে। ভাগ্য বিড়ম্বনায় এবং রাজনৈতিক দাবা খেলার ক্রীড়ণক হয়ে আজ তাকে নিজের ভাগ্যান্বেষণে এই চাকরী নিতে হলেও পারিবারিক ঐতিহ্য একেবারে নিঃশেষ হয়ে শুকিয়ে যায়নি তার মধ্যে।

তাই সতীর সঙ্গে একত্রে মেসিং করতে যেয়ে হয়ত তার খরচ কিছু বেশী হয়ে যেতো, কিন্তু এজন্য তার আক্ষেপের কিছু ছিল না। কারণ নন্দার রোজগারের অর্থ একান্তই তার নিজস্ব। তাতে মা বাবা ভাই বোন কারোরই দাবী ছিল না বা কেউ-ই ভাগ বসাতে আসতো না বা! তেমন প্রয়োজনও ছিল না।

নন্দার বাবা ছিলেন কনজারভেটিভ্ (রক্ষণশীল ব্যক্তি)। তাই তিনি মেয়েদের বেশী লেখা পড়া শেখানোর বিপক্ষে ছিলেন। বড় মেয়েদের টাকার ওজনে বড় ঘরে সুপাত্রে পাত্রস্থ করেছেন। নন্দাকেও তাই করতেন।

কিন্তু পূর্ব বাংলার হিন্দুদের যে এমন ভাবে কপাল পুড়বে—তিনি তা জানতেন না। তাই নন্দারও উচ্চশিক্ষা নেবার অবকাশ আর হয়নি।

অবশ্য দেশ বিভাগের পর নন্দার ছোট বোনেরা এ দেশে এসে উচ্চশিক্ষা নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে কেউ বা ডাক্তার, কেউ বা উকিল, কেউ বা প্রধানা শিক্ষিকা হয়েছে। কেউ বা ডক্টরেটের জন্য স্কলারশিপ্ নিয়ে সাগরপাড়িও দিয়েছে। এবং উপযুক্ত পাত্রে তাদের বিয়েও হয়েছে।

কেবল হতভাগী নন্দা সুদূর গ্রামাঞ্চলে ছোট্ট পরিধির মধ্যে—স্বল্প আয়ের তার ছোট্ট চাকরীতেই খুসী।

সামান্য লইয়া থাকার মধ্যে সুখ ও শান্তি আছে—নন্দা তাই প্রমাণ করতে বদ্ধ পরিকর। সদা সেবাব্রতী, হাস্যময়ী নন্দাকে কেউ কখন তার ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শোনেনি।

পরিশেষে বিয়ে যাকে সে করেছিল—কোন দিকেই সে নন্দার যোগ্য নয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, চেহারা—এমন কি আয়েও সে নন্দার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। সব দিক দিয়েই সে নন্দার চেয়ে ছোট, শারীরিক অনেক খুঁতও তার আছে।

তবু নন্দার বাবা যখন বিনা খরচে মেয়েকে গোত্রান্তর করতে সর্ব

দোষ যুক্ত একজনকে পাত্র মনোনীত করলেন, নন্দা তাতেও আপত্তি না করে তাকেই বরমাল্য পরিয়ে দিয়ে ছিল রেজিষ্টারী অফিসের একটা সই এর মারফতে।

নিজের হাতে সংসারের সমস্ত কাজ সুগৃহিণীর মত সুষ্ঠুভাবে ছিম্‌-ছাম্‌ করে নন্দা—সতীর সম্মিলিত সংসারটা গুছিয়ে রাখতো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এক স্নিগ্ধ আবহাওয়া যেন তাদের ছোট্ট সংসার ঘিরে ছিল।

নিজের হাতে নানা রকম রান্না করে লোককে খাওয়াতে নন্দা ভালবাসতো। পরের সেবা করার মধ্যে সে পেতো অনাবিল আনন্দ। তাই নন্দার এই লোক খাওয়ানোর খেয়ালে সে অনেক সময় বে-হিসাবী হয়ে পড়তো।

সতীই তখন তা সামলে দিত। নতুবা ওদের যৌথ বাজেট হয়ত ফেল পড়ত। সতী নন্দার এই উদার মনকে প্রশ্রয় দিত তার স্নেহের খাতিরে। মাসান্তে যখন দেখা যেতো বাজেটের থেকে ব্যয় হয়ে গেছে বেশী, নন্দা তখন অপরাধীর মত বিব্রত মুখ করত। সতী বুঝতো নন্দার দুর্বলতা কোথায়॥

তাই ঘাট্‌তিটা সে পুষিয়ে দিত। প্রতিবারই নন্দা বলত—এবার হতে বাজেট আর ডিঙাবো না। সতীদি, দেখে নিও, এবার হতে আমি ভীষণ কৃপণ হব। কিন্তু প্রতিবারই তার সরল ও উদার মনের জন্য ঘাট্‌তি হতো।

সতী নন্দার স্বভাব চরিত্র অল্প দিনেই বুঝতে পেরেছিল। তদুপরি অল্প দিনেই নন্দা সতীকে তার নিজের দিদির মতই কাছে টেনে নিয়ে জানিয়েছিল তাদের পারিবারিক সাংসারিক সব কথা।

প্রতিদিন বিকেলে সতীর কোয়ার্টারের বারন্দায় বসত মজলিস্‌। গ্রামের অন্যান্য স্বল্প শিক্ষিতাদের। তারা কেউ জুনিয়ার বেসিক শিক্ষিকা, কেউ সমাজ কল্যাণের গ্রাম সেবিকা, কেউ বা প্রি-বেসিকের শিক্ষিকা।

নানা রকম সেলাই ও হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে চলতো নানা আলাপ আলোচনা সুখ দুঃখের কত গল্প গুজব ! সময় সময় এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সুমধুর কণ্ঠে গান গেয়ে জ্যোৎস্না স্নাত সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশটাকে সুন্দরতর করে তুলতো।

উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের সানিদ্ধ্য এই অঞ্চলে পাওয়া না গেলেও, যে কয়জন মেয়ে রোজ সতীর কোয়ার্টারে আসর জমাতে আসত—তাদের মনগুলি ছিল সুন্দর।

তাদের কেউ কেউ কুমারী বা বিধবা, কেউ বা স্বামী পরিত্যক্তা। যারা বিবাহিতা—তারাও এখানে একাই থাকতো সহকর্মীদের সঙ্গে। স্বামী বা সংসারের আর কেউ তাদের কর্মস্থলে থাকতো না বা আসতো না। তাই এদের সুখ দুঃখের কাহিনী সতীর মনে এদের প্রতি সহানুভূতি জাগাতো।

শহুরে মেয়ে সতী। অভাবের সংসারে তার জন্ম নয়। পরন্তু উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে সে। সারা জীবন শহরেই বড় হয়েছে। তাই গ্রাম্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এই অল্প শিক্ষিতা দুঃখিণী মেয়েদের মধ্যে নিজেকে সে সুন্দর ভাবে মেলে দিয়েছিল।

পঞ্চানন বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিদেশী অন্যান্য শিক্ষকদের মত সে-ও সপ্তাহান্তে চলে আসতো কলকাতায়। তাই গ্রাম্য পরিবেশে তার ক্লান্তি জন্মায়নি। পরন্তু একটা কৌতূহলের রেশ টেনে চলছিল তার মনে।

এই স্কুলে সে ছিল একমেবাদ্বিতীয়ম্ শিক্ষিকা। বিশেষ করে সে ছিল উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিকা। সুতরাং স্কুলে, গ্রামে সবাই তাকে সমীহ করে চল্‌তো। কারো বাড়ী কখনও সতী যেতো না। তাই পল্লী জীবনের পঙ্কিলতা তার গায়ে বা মনে লাগত না।

সতীর আগে পঞ্চানন বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষিকা ছিলেন, যদিও সে স্বামী পুত্র সহ ঐ গ্রামে বসবাস করতো। তবু তার সম্বন্ধে অনেক নোংরা কথাই সতী এসে শুনেছে। হয়ত তার কিছু অতি

রঞ্জিত। তবু যা রটে তার কিছু বটে—বলে যে প্রবচন বাক্য আছে হরিদাসী সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য।

হরিদাসী ছিল বিদ্যালয়ের নীচু শ্রেণীর দিদিমণি। স্নাতকোত্তীর্ণ নয় বলে—উঁচু শ্রেণীতে ঢুকবার পাসপোর্ট সে পায়নি। তবে স্কুল তাকে উঁচু শ্রেণীতে পড়াবার যোগ্যতা অর্জন করবার অনেক সুযোগই দিয়েছিল। বাবে বারে সাটেল কর্কের মত সে স্নাতক পরীক্ষার জন্য বসে ফিরে আসতে লাগলো। স্নাতক হতে সে কখনই পারেনি। পরন্তু তার আচার ব্যবহারে ছিল শালীনতার অভাব। যার জন্য সে ছাত্র-ছাত্রীদের থেকেও তেমন শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্জন করতে পারেনি, তেমনি গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধাও পায়নি।

মেয়েরা তাদের শ্রদ্ধা নিজেদের যোগ্যতার দ্বারাই অর্জন করে থাকে। এজন্য অন্যদের দোষারোপ করা ভুল। মেয়েদের আচার ব্যবহারে যদি নিন্দনীয় কিছু না থাকে, শালীনতার অভাব না থাকে—তবে তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা সে অবশ্যই পেয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিকাদের রুচি, চলন, বলনই তাদের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধাই শুধু জাগায় না, তারা সবার সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে।

হরিদাসীর অযোগ্যতা সত্ত্বেও কেনারাম গাইন তাকেই স্থায়ী শিক্ষিকা করতে ব্যস্ত। কারণ পঞ্চানন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিজেই ভজহরি তলাপাত্রের সুপারিশের জোরেই একদা বোর্ডের অনুমোদন পেয়ে ছিলেন স্থায়ী শিক্ষকের গদীতে।

কারণ বোর্ডের নিয়মানুসারে যে যোগ্যতায় ঐ গৌরবময় গদীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, প্রধান শিক্ষক কেনারাম গাইনের তা ছিল না।

ভজহরি তলাপাত্র কিশলয় পঞ্চানন বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করে ছিলেন গাঁয়ের ও তারই আশে পাশের গাঁয়ের ছেলে মেয়েদের নিয়ে। শিক্ষকতাও করতেন গাঁয়েরই ছেলেরা। যাদের মধ্যে অনেকেই এই শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের যোগ্যতা বাড়িয়ে নিয়ে ছিলেন ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ

হয়ে। তাঁদের ত্যাগ ও একনিষ্ঠতাই গড়ে তুলেছিল পঞ্চানন বিদ্যালয়।

কিন্তু যখন তা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে আসলো, তখন ভজহরিবাবুর দৃষ্টি ভঙ্গী বদলে গেল। তিনি এই বিদ্যালয়কে কেবল বহুমুখী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতেই বদ্ধ পরিকর হলেন না, তিনি গ্রাম্য শিক্ষকদের সাধারণ বেশভূষা, গতিবিধিও পছন্দ করলেন না।

শহুরে চটক লাগলো তার চোখে। তাই বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য তিনি কেবল উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকই নিয়োগ করলেন না, তিনি শহুরে স্মার্ট শিক্ষকদের নিয়োগ করলেন—যা'তে গ্রাম্য ছেলেরাও এসব শিক্ষকদের আদর্শে চটপটে হয়ে উঠে চলনে, বলনে কাজে কর্মে।

ভজহরি তার পছন্দ মত শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করলেন। তাদের ধরে রাখবার জন্য যথা সম্ভব ব্যবস্থাও অবলম্বন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাদের প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের জন্ম ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি তাদের উচ্ছেদ করবার সুযোগ সন্ধান করতে সুরু করলেন।

ফলে নবাগতের দল পুরাতন মহলে সাদর অভ্যর্থনা পেলো না। পরন্তু এঁরা যেন তাঁদের চক্ষুঃশূল হয়ে পড়লেন। এই নতুন ও পুরাতন—দুটো গ্রুপ হয়ে দাঁড়াল। নতুনের রক্ষাকর্ত্তা বা নায়ক ভজহরি তলাপাত্র এবং পুরাতনদের ত্রাণকর্ত্তা বা প্রতি নায়ক কেনারাম গাইন।

ভজহরি জানেন পুরাতনদের কার কোথায় দূর্বলতা। তলাপাত্রের বোর্ডে দহরম মহরমও কিছুটা ছিল। তাই তিনিও জানতেন কাকে কোন প্যাঁচে আটকে দেওয়া যায় বা বিদায় করা যায়। কিন্তু যে বিষ তলাপাত্র স্বেচ্ছায় একদিন গলাধঃকরণ করেছেন, তা যেমন তিনি হজম করতেও পারছেন না, তেমনি ফেলতেও পারছেন না।

কারণ এই কেনারাম ও তাঁর সহকর্মীদের যোগ্যতা তেমন না থাকা সত্ত্বেও তিনিই বিদ্যালয়ের স্থিতির জন্য বার বার হাঁটাহাঁটি করে

এদের চাকরীতে স্থায়ীভাবে বহাল রাখবার সুযোগ করে দিয়ে ছিলেন।

তাই আজ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেলেও, নিয়ম কানুনের বেড়া জাল ছিন্ন করে এঁদের উচ্ছেদ করবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

অথচ নতুন পরিবেশে ভজহরিবাবুর মতে—এঁরা বেমানান। এঁদের প্রভাবে গ্রাম্য ছেলেরা স্মার্ট হবে না। এরা যেন সব ঝিমিয়ে চলে। এঁদের প্রভাবে লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচে আড়ষ্ট করবে ছাত্রদের প্রতি পদক্ষেপ। তাই ভজহরিবাবু ও পুরাতনদের মধ্যে এসে পড়ল এক আইডিয়েলের লড়াই।

এই লড়াইতে প্রথমেই পুরাতনের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল সতী। কারণ সতী ও প্রধান শিক্ষক একই বিষয়ের এম, এ। হয়ত এটাই সতীর দোষ।

তাই একদিন কেনারাম তার পুরাতনী ব্যাটেলিয়ান ও তাঁরই পক্ষের কিছু গ্রামবাসীদের নিয়ে স্কুলে একটা মিটিং ডাকলেন। সে সভায় সতীকেও আমন্ত্রণ করে আনা হল।

সেই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য সতী থাকবে—না হরিদাসীকে বিদায় নিতে হবে। তাই এই ভাঙ্গন রোধের পূর্ব সূচনা। পুরাতনী জোটের একটি যদি ঝরে পড়ে, তবে এক এক করে হয়ত নানা ছিদ্র-পথে অন্যদেরও হরিদাসীর পথে অনুগমন করতে হবে। এই কারণে হরিদাসীর স্বপক্ষে এই সভা।

সতীর জীবনে এই ধরণের রেষারেষি এই প্রথম। বিশেষ করে নিয়োগ পত্র পেয়ে চাকরীতে নিযুক্ত হওয়ার পর যখন শোনা যায়—তুমি সারপ্লাস্ বা তোমার প্রয়োজন নেই, তবে পরিস্থিতিটা কেমন হয় পাঠকবর্গ আশা করি অনুভব করতে পারবেন।

নীরবে সতী সেই সভার সব বিষ গলাধঃকরণ করে এল। কিন্তু উদগার করবার সুযোগ পেলো না। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই ছুটির দিনের

সভায় একমাত্র সতী ব্যতীত নবাগত গ্রুপের অন্য কোন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন না।

সবাই সপ্তাহান্তে যে যার জায়গায় ফিরে গেছেন। তাই সতীর পক্ষ নিয়ে ঐ সভায় যুঝবার কেউ ছিলেন না। এমন কি ভজহরিবাবুও সেদিন গ্রামে অনুপস্থিত। তাই এই সুন্দর সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কেনারাম গাইন কিছুমাত্র বিলম্ব করেনি।

খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে গেল ভজহরিবাবুর কাছে। তিনি পরদিনই ছুটে এলেন গ্রামে। প্রতিপক্ষের বিরাট সভার আয়োজন সুরু হল। ভজহরিবাবু জানালেন এই বিদ্যালয়কে উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয় করতে হলে—সেই যোগ্যতার শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন। যদি যথা উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া না যায়—তবে বোর্ড বিদ্যালয়কে উচ্চতম বিদ্যালয়ে পরিণত করতে দেবে না।

গ্রামের ও বিদ্যালয়ের স্বার্থ বড়, অথবা মুষ্টিমেয় শিক্ষকের স্বার্থ বড়—সেই জিজ্ঞাসাই তিনি সবার সমক্ষে তুলে ধরলেন। হরিদাসীর অযোগ্যতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি জানালেন—চারবার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সে স্নাতকোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

তবু যদি হরিদাসীকে এই বিদ্যালয়ে রাখা হয়, তবে এই বিদ্যালয়ে অষ্টমোত্তর শ্রেণীগুলিতে মেয়েদের ভর্ত্তি করা চলবে না। যেহেতু শিক্ষিকার অষ্টমোত্তর শ্রেণীতে পড়াবার যোগ্যতা নেই, সুতরাং ঐ সব শ্রেণীতে মেয়েদের রাখা সম্ভব নয়। তারই পাশে ভজহরি তুলে ধরলেন সতীর শিক্ষা, অভিজ্ঞতার ফর্দ্দ। এক বাক্যে উপস্থিত গ্রামবাসী হরিদাসীকে নাকচ করে সতীর নিয়োগকে সমর্থন জানালেন।

এই ভাবে প্রতিটি ব্যাপারে ভজহরিবাবু গ্রামের শিক্ষিত, হিতাকাঙ্ক্ষী ভদ্রলোকদের সমর্থন পেলেন। ক্রমেই পুরাতনী ব্যাটেলিয়ানরা নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে লাগলো। যদিও হরিদাসী ব্যতীত অন্য কাউকেই গদীচ্যুত করা সম্ভব হল না।

কেনারাম গাইন তখন উঠে পড়ে লাগলেন পুরাতনীদের নানা ভাবে সহায়তা করে, নবাগতদের নানাভাবে বেকায়দায় ফেলবার ষড়যন্ত্রে।

পুরাতনী দলের মধ্যে একজন ছিলেন—যিনি পুরাতনী এবং উদ্বাস্তু স্থানীয় বাসিন্দা হলেও—তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল। তিনি একদিন টেরোরিষ্টও ছিলেন। তাই তিনি বয়োজেষ্ঠ্য হলেও কেবল উদার মতালম্বীই নন্, উদারচেতাও ছিলেন।

তিনি ছিলেন অতি সরল ও ভালমানুষ। তাই প্রত্যক্ষে তিনি তার দলের বিরুদ্ধাচারণ করে নবাগতদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার সাহস না পেলেও পরোক্ষে তিনি তাদের সমর্থন জানাতেন।

গ্রাম্য শত্রুতাকে তিনি ভয় করতেন। ছা-পোষা মানুষ। স্কুলও টিউশনি করেই শৈলেশ্বরবাবুর দিন কাটে। কারো সাতে পাঁচে তিনি নেই। কোন দলের মধ্যে নেই। তাই তিনি সবারই। তিনি ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক। শুনতে না চাইলেও—পুরাতনী দলের অনেক খবরই তাঁর কানে আসতো। কারণ তাঁরই সামনে একই টেবিলে কেনারামের নেতৃত্বে চলত সব ষড়যন্ত্র।

শৈলেশ্বরবাবুর সমবয়সী কোন শিক্ষক নেই। তাই তিনি মৌখিক আলাপ সবার সঙ্গে রাখলেও কোন দলেই ভিড়তেন না। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে চলতেন।

তবে ভজহরিবাবুর ভজনায় মাঝে মাঝে হয়ত তাঁকে কিছু কিছু খবর পরিবেশন করতে হত অতি সংগোপনে। কারণ খবর যদি ফাঁস হয়ে যায়, তবে শৈলেশ্বরবাবুর অবস্থা শোচনীয় হবার সম্ভাবনা।

দুই ফ্রণ্টে ঠাণ্ডা লড়াই চলেছে। এ পক্ষ প্রতি পক্ষের ত্রুটি ধরতে ব্যস্ত। নবাগতের দল পুরাতনীদের শিক্ষা পদ্ধতির ভুল ত্রুটি ধরে ভজহরিবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর ভজহরিবাবু সেই ভিত্তিতে পুরাতনীদের গোড়া নাড়বার চেষ্টা করে।

প্রধান শিক্ষক নবাগতদের দৈনিক অতিরিক্ত ক্লাশ দিয়ে তাদের

অবসর পিরিয়ড গুলি মুছে দেন্। অথবা এম, এস, সি শিক্ষককে পাঠান এগার শ্রেণীর ইংলিশ ক্লাশে। বা ইতিহাসের এম, এ কে পাঠান দশম শ্রেণীর বিজ্ঞানের ক্লাশে। অথবা বাংলার এম, এ কে পাঠান দশম বা একাদশ শ্রেণীর অঙ্কের ক্লাশে। এই ভাবে ছাত্র মহলে নবাগতদের অপদস্থ করবার ষড়যন্ত্র চলে।

কিন্তু এরা সব শহরে ঘু ঘু। ক্লাশ ম্যানেজ করার কলা কৌশল তাদের অজানা নয়। তাই যাকেই যে শ্রেণীতেই পাঠান হোক্— ঠিক তিনি পূরো ক্লাশটা কৌশলে ম্যানেজ করে সহাস্যে বেড়িয়ে আসেন।

ছাত্ররাও গ্রাম্য পুরাতন শিক্ষকদের থেকে নবাগতদের বেশী অনুগত। কারণ নতুন মাষ্টারমশায়রা মারেন না, বকেন না। পরন্তু ছাত্রদের বশ করবার কলা কৌশল জানেন। তাই তাদের ক্লাশে তারা কোন রকম গোলমালও করে না।

তারপর সুরু হল কেনারাম ও ভজহরিবাবুর একে অন্যকে গদিচ্যুত করার সংগ্রাম। ভজহরিবাবু ম্যানেজিং কমিটির মিটিং এ কেনারামের যোগ্যতা ও তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে তাঁকে গদিচ্যুত করবার চেষ্টা করেন।

কেনারামও পিছিয়ে যাবার পাত্র নয়। তিনি ও আট ঘাট বেঁধে নেবে পড়েছেন সম্মুখ সমরে।

স্কুল ফাণ্ডে অর্থাভাব। কিন্তু শিক্ষকদের সময় মত বেতন দিতে হবে। এজন্য ভজহরিবাবু কৌশলে বা কিছু অপকৌশলে বোর্ড ও ডি, পি, আই অফিস হতে কিছু টাকা সংগ্রহ করে সেই অভাব পূরণ করছিলেন।

কেনারামই একদিন ভজহরিবাবুর এই সব অপকর্মের সহায়ক ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি যখন ঘোলাটে হয়ে দাঁড়াল—তখন কেনারামই ভজহরিবাবুর সেই গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিলেন। গোপনে খবরটা ডি, পি, আই অফিসে কেনারাম সজ্ঘ জানিয়ে দিল।

হঠাৎ আবির্ভাব হল ডি, পি, আই অফিসের ঊর্দ্ধতন এক অফিসার। বিষয় বস্তুটির তদন্ত করতেই তার আগমন। ভজহরি-বাবুও গোপন নালিশ পাঠিয়েছে কেনারামের বিরুদ্ধে বে-আইনী অনেক কার্য্য কলাপের। দুই পক্ষেরই নালিশের তদন্তে এসেছেন অফিসার।

ভজহরিবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি এই স্কুলে মেয়েদের ও ছেলেদের হোষ্টেল আছে দেখিয়ে সরকার হতে মাসে মাসে উভয় হোষ্টেলের সুপারদের মাইনে ও নানা খরচ বাবদ টাকা উঠিয়েছেন।

সতী মেয়েদের হোষ্টেলের সুপার এবং পুরাতন গ্রুপের একজন শিক্ষক ধনঞ্জয় প্রামাণিক ছেলেদের হোষ্টেলের সুপার। উভয়ের নাম সই করে ভজহরিবাবু নিজেই বোর্ড ও, ডি, পি, আই অফিস হতে টাকা তুলে নিয়েছেন মাসের পর মাস।

তদন্তে ভূয়া হোষ্টেলের কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না। সতীর থেকে তদন্ত অফিসার লিখিয়ে নিলেন যে পঞ্চানন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোন মেয়েদের হোষ্টেল নেই এবং তিনিও কোন হোষ্টেলের সুপার রূপে কখনও কোন টাকার রসিদে সই করেননি।

ধনঞ্জয়বাবু সই দিতেন। অবশ্য তাঁর ব্যাপারটি একটু ভিন্ন ধরণের। বিদেশী শিক্ষকদের যে মেস্ ছিল—সেই মেসে ভিন্ গাঁয়ের ধনী পুত্র রজত বাস করত খোরাকী খরচ দিয়ে। তাই ধনঞ্জয়বাবু সেই কিশোর বালকটির বসবাসের সুযোগ নিয়ে সই করতেন সুপারের নামে। তাঁর ব্যাপারটা অশ্বত্থমা হত ইতি গজঃ র অনুরূপ হয়ে দাঁড়াল।

অর্থাৎ ধনঞ্জয়বাবুর পরিচালিত যদিও কোন হোষ্টেল নেই—তবু একটি ছেলে থাকে শিক্ষকদের মেসে। তাই পরোক্ষে তাকেই কেন্দ্র করে তিনি ছেলেদের হোষ্টেল গড়বার ভিত তৈরী করলেন।

অবশ্য প্রামাণিক মশায় কেবল কলমের খোঁচায় সই-ই দিয়েছেন,

ভজহরিবাবু হতে সুপার হিসাবে একটি পয়সা কখনও পাননি বা অন্য কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধাও না।

এই ঘটনার পর পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে গেল। ভজহরিবাবুর এইভাবে নানা কলা কৌশলে অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষকদের মাসিক মাইনেও নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছিল না।

কারণ ছাত্রদের থেকে বার্ষিক প্রমোশনের সময়েই একমাত্র প্রমোশন আটকানোর ভয়ে কিছু কিছু টাকা উশুল হয়। নতুবা গ্রাম্য স্কুলগুলিতে মাসিক আয় প্রায় এক রকম শূন্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় বিদেশী শিক্ষকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল—সকলেই প্রায় দরখাস্ত ছাড়তে লাগলেন বিভিন্ন শহরে বা শহরতলীর বিদ্যালয় গুলিতে – এবং যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পাসপোর্ট থাকায় সহজেই তাদের চাকরী জুটে যেতে লাগলো।

এক এক করে অন্যান্যদের মত সতীও কেটে পড়ল ঐ স্কুল হতে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

ভজহরিবাবুর কূটবুদ্ধিও এইসব শিক্ষকদের পঞ্চানন বিদ্যালয় ত্যাগে তরান্বিত করেছিল। ভজহরিবাবুর পকেট গড়ের মাঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও নিভে গেল। কেনারাম গাইন সদল বল নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে মজলিস্ জাঁকিয়ে বসবার সুযোগ পেলো।

ভজহরিবাবু তখন তাঁর গ্রাম্য নানা নোংরামীর মাধ্যমে কেনারামকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা ফাঁদতে লাগলেন। তাঁর এসব নোংরা কাজে বিদেশী শিক্ষকদের সহায়তা চাইলেন—যাঁদের উপর গ্রামবাসীদের আছে শ্রদ্ধা।

কিন্তু শহুরে যুবক শিক্ষকমণ্ডলী এসব নোংরামীর মধ্যে যেতে রাজী না হওয়ায় ভজহরিবাবু তখন স্ব-রূপ ধারণ করলেন। মনে

করলেন পুরাতন পন্থীদের মত এঁদের উপরও তাঁর খেয়াল খুসীর চাবুক চালিয়ে যাবেন।

তাই যে শিক্ষককে ডেপুটেশনে বি, টি পড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এনেছিলেন, তাঁর সেই সর্ত্ত ভঙ্গ করলেন। যে ইংলিশের অধ্যাপককে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বে-সরকারী কলেজের চাকরী হতে তাঁর প্রতিষ্ঠানে টেনে এনেছিলেন —তাও ভঙ্গ করলেন।

যে বিজ্ঞান শিক্ষককে অতিরিক্ত বেতন দেবার সর্ত্তে নিয়োগ করেছিলেন—তাও ভঙ্গ করলেন।

এইভাবে বিদেশী উচ্চশিক্ষিত প্রত্যেক শিক্ষক বা শিক্ষিকাকেই বিশেষ কোন সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দূর এই গ্রামাঞ্চলে টেনে এনেছিলেন—তাঁদের আকর্ষণীয় সেই সব সর্ত্ত তিনি এক এক করে ভঙ্গ করতে সুরু করলেন, যখন তিনি দেখলেন তাঁর ডান হাতের জোর কমে আসছে—নতুন রিক্রুটের শিক্ষকরা আর তাঁর কব্জীর জোর বাড়াচ্ছে না—তখনই তিনি তাঁদের জব্দ করবেন মনে করে তাঁর প্রতিশ্রুতির বিপরীত আচরণ সুরু করেন।

স্বল্প শিক্ষিত ভজহরিবাবুর চাতুরী শিক্ষকদের বুঝতে দেরী হলো না। ফলে তাঁর ভরা হাট শূন্য হতে সময় লাগল না। কারণ এসব শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেদের বিদ্যার জোরেই সকলেই অন্যত্র সুপ্রতিষ্ঠিত কেবল হলেন না—পরন্তু সকলেরই উন্নতি হল—এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে।

অন্য দিকে তলাপাত্রের কপালও ভাঙ্গলো। পরবর্তী ইলেক্‌শনে সেক্রেটারী পদচ্যুত হলেন। এবং তিনি জোনাকীর মত জ্বলতে লাগলেন স্কুল কমিটির এক সাধারণ সদস্য পদ দখল করে।

কিন্তু তলাপাত্রের সেই সুখও তার পরবর্তী ইলেকশনে টিক্‌লো না। তলাপাত্রকে স্কুল কমিটির তলানীতেও আর পড়ে থাকতে

দেখা গেল না। এক কথায় তাঁর সমূলে উচ্ছেদ হল—তাঁরই গড় শিক্ষায়তন হতে।

অদৃষ্টের কি পরিহাস। দোষ তাঁর নিজেরই। কেবলমাত্র আপন বিমৃষ্যকারিতাই তলাপাত্রকে তলিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

পঞ্চানন বিদ্যালয়ের জৌলুসও নিষ্প্রভ হয়ে গেল। এই বিদ্যালয়ের যে আকর্ষণী শক্তি ছিল আশে পাশের দশ বিশটা গাঁয়ের উপর—তাও নষ্ট হ'য়ে গেল। ক্রমেই ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও এই বিদ্যালয়ে হ্রাস পেতে লাগল।

৪

সতী কলকাতার শহরতলীর সুবালা বালিকা বিদ্যালয় নামে একটা স্কুলে চাকরী নিলো।

প্রধানা শিক্ষিকা হতে সুরু করে সব শিক্ষিকা, ছাত্রী, পিয়ন এমন কি ঝি অবধি এই স্কুলের উদ্বাস্তু। তাই স্বভাবতঃ সকলেই সমব্যথী। ছাত্রীরাও অধিকাংশ উদ্বাস্তু পরিবারের। ঐ অঞ্চলে সবার সহযোগীতায় গড়ে উঠেছিল এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি।

অনাড়ম্বর পরিবেশে শিক্ষা দান সুরু হল। মাঝে মাঝে শিক্ষিকারা স্কুল ফাণ্ডে টাকা তুলবার জন্য টিকিট করে ছাত্রীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে, কখনও বা বক্স কালেক্‌সন্‌ করে বিদ্যালয়ের সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করে।

প্রধানা শিক্ষিকা হয়ে যিনি এলেন—এককালে তিনি রাজনীতির বিশেষ এক দলভুক্ত ছিলেন। বয়োজেষ্ঠ্য তিনি অন্য শিক্ষিকাদের তুলনায়। তাই বোর্ডের উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বসানো হল প্রধানা শিক্ষিকার পদ অলঙ্কৃত করতে।

সতীরা মুষ্টিমেয় শিক্ষিকারা স্কুলটাকে দাঁড় করানোতে যথা সম্ভব কৃচ্ছ্র সাধন করেছে। মাইনার খাতায় পুরো সই করে—কোন মাসে হয়ত কিছুই ঘরে নিতে পারেনি। কোন মাসে হয়ত নেহাৎ হাত খরচ বাবদ ৫৲।১০৲ পেয়েছে।

১০-৫ টা একটানা এক একজন শিক্ষিকা ক্লাশ নিয়েছে। অর্থাভাবে পিয়ন, দপ্তরীর কাজও হয়ত তাঁদেরই করতে হয়েছে। তবু সবার মধ্যে দেখা গেছে একটা উৎসাহ, একটা প্রেরণা, আনন্দ।

শিক্ষিকারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে স্কুলটাকে দাঁড় করাবার

জন্য। প্রধানা শিক্ষিকা ননীদি যথা সম্ভব কম শ্রম করেও অন্যদের কৃচ্ছ্রতার কৃতিত্বটা নিজেই উপভোগ করতে চাইতেন।

অতি বুদ্ধিমতী ও সুবিধাবাদী বিধবা মহিলা তিনি। অবশ্য বৈধব্যের পোষাক তিনি পরেন না। সেটা এ যুগে রেওয়াজ নেই বড়। সীমন্তে সিঁন্দুরের রেখা, কপালে সিঁন্দুর বিন্দু, লোহা, শাঁখা নেই হাতে। আর সব কিছুই ঠিক আছে। অর্থাৎ পোষাকে ও অবয়বে চিরকুমারী বলে ভুল-করা অসঙ্গত নয়।

কয়েকটি সন্তানের জননী, কিন্তু তাও বোঝা যায় না—তাঁর খুকী খুকী ন্যাকামীপনা হতে। অন্য শিক্ষিকাদের ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত করেও তিনি সর্বদা বেতনের বেশী অংশ নিজে নিতেন।

সতীরা ভাবতো—বেচারী ননীদি বিধবা, তদুপরি মা, তাঁর সংসারের দায় দায়িত্ব ব্যয় ভার তো তাঁকেই বহন করতে হতো। তাই অন্য শিক্ষিকারা ননীদির কোন কাজেই বাধ সাধতো না বা দৃষ্টিকটু কিছু ঘটলেও—তা নিয়ে কোন সমালোচনা করত না।

সতীরও অন্য সব শিক্ষিকারই গায়ে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আনকোরা একটা গন্ধ পাওয়া যায়। এখনও তাদের দেখলে ছাত্রী বলেই ভুল হয়।

তাই কাজে আছে এদের একান্ত নিষ্ঠা, ত্যাগের মধ্যে অপার আনন্দ, নতুন কিছু গড়বার প্রেরণায় এনার্জি স্বচ্ছ নির্ঝরিণীর মত দু'কূল ভাসিয়ে ছুটেছে। এদের দেখে মনে হয়, না জানি কতটা দম দিয়ে বিশ্বকর্মা এদের সৃষ্টি করেছেন, যে কারণে এদের কর্ম ক্ষমতায় কোন আঘাতে ভাটাও পড়ছে না বা তা স্তব্ধ হয়েও যাচ্ছে না।

স্কুলের রেজাল্ট ভাল না হলে বোর্ডের অনুমোদন পাওয়া যাবে না। এবং বোর্ডের অনুমোদন না পেলে অর্থ সাহায্যও পাওয়া যাবে না বোর্ড হতে।

উদ্বাস্তু ছাত্রীদের নামেই কেবল বেতন। অধিকাংশেরই বেতন দেবার সামর্থ নেই। রুটিন মাফিক সতীরা শিক্ষকতা করত না।

স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ের পরও স্কুল ফাইন্যালের ছাত্রীদের নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে তারা ছাত্রীদের পড়াত।

এই নিঃস্বার্থ সেবা, শিক্ষিকাদের একনিষ্ঠতা, শ্রম ও ত্যাগের ফলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে সুরু করল সুবালা বালিকা বিদ্যালয়টি।

বাঁশের ঘরের খোলস বদলে হল পাকা দালান। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের যশও চারিদিকে ছড়াতে লাগল, ছাত্রীরাও আকৃষ্ট হতে লাগল। ছাত্রী সংখ্যাও বাড়তে লাগল। বিদ্যালয়ের ফলাফল ভাল হওয়ার জন্য যথাক্রমে স্কুলটি বোর্ডের অনুমোদন লাভ করল।

বোর্ডের ও সরকারী সাহায্য আসতে লাগল। আর জুটতে লাগল মক্ষিকার দল। স্কুলের হিতাকাঙ্ক্ষী দেখা দিল এখন অনেক। যারা নাক উঁচিয়ে চোখ ঘুরিয়ে, ভ্রূ কুঁচকিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে এই উদ্বাস্তু বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা শ্লেষোক্তি করত, তারাও আজ এই স্কুলের পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর নামাবলী পরে ঘন ঘন স্কুল আঙ্গিনায় আনাগোনা সুরু করল।

স্কুল কমিটিতে ঢুকবার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, কারণ এই কমিটিতে কিছু লোভনীয় পদ থাকে। ঐ সব আসন ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলে অনেক অভাগার অভাব অনটন দূর করবার সুযোগ আসে। বেকার জীবনেও ফেঁপে ওঠা যায়।

একদিকে যেমন স্কুলের স্বচ্ছলতা, শ্রী বৃদ্ধি বাড়তে লাগল, তেমনি অন্যদিকে যে শিক্ষিকাদের একান্ত পরিশ্রমে, অধ্যবসায় শিশু স্কুলটি আজ খুঁটি শক্ত করে বিরাট মহীরুহে পরিণত হচ্ছে, তাদের মূল্য ক্রমেই ননীদি ও স্কুল কমিটির কাছে হ্রাস পেতে লাগল।

তাদের শ্রমের, আন্তরিকতার মূল্যের স্বীকৃতি দিতে আজ আর কেউ রাজী নয়। তারা ক্রমেই যেন এই প্রতিষ্ঠানে আশ্রিতা হয়ে পড়ছে। এরা যেন ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে এসেছে। তাই এদের কি ভাবে হটিয়ে দেওয়া যায়—সেটাই যেন বর্তমান সেক্রেটারী ও ননীদির একমাত্র চিন্তনীয় বস্তু। কারণ এরা যে যথার্থই নিঃস্বাথ

ভাবে ছাত্রীদের ও প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনা করে। এটাই যে আধুনিক যুগে সব চেয়ে ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন্‌।

ননীদি ক্লাশ প্রায় নেনই না। যদি বা কখন ক্লাশ নেন, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ছাড়া অন্য কোন ক্লাশে কখনও ভুলেও ঢুকেন না।

তাঁর অফিসের কাজকর্ম সব করতো ইংলিশের অনার্স শিক্ষিকা কনিকা মিত্র। অবশ্য এজন্য কনিকারই খাটুনী বাড়তো—লাভ কিছু হত না। স্কুলের টিফিনের সময় বা ছুটির পরে স্কুল সংক্রান্ত যত চিঠিপত্র, হিসাব নিকাশ, নোটিশ সব কনিকাই ননীদির জন্য লিখে দিত।

বোর্ডের কাজে যত ছুটাছুটি বা কথা বলবার জন্য ননীদি সঙ্গে নিতেন রমা গুপ্তাকে। কারণ রমা স্মার্ট মেয়ে। কথাবার্তায় সে তুখোড়, কথার জাল বিছিয়ে কাজ কি করে হাসিল করতে হয়, সে তা জানে। তাই রমাকে ছাড়া ননীদি বোর্ডে বা যেখানে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে, এমন কোন জায়গায় একা যেতেন না।

তন্বী, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। সুভাষিণীর আদর সর্বত্র। তাই ননীদি যখনই যে কাজ উদ্ধার করতে চান—রমা তাঁর সঙ্গিনী।

ননীদি বয়স্কা। যদিও চাকরীর খাতায় বয়সে তিনি এখনও সবে প্রস্ফুটিত মুকুল। চেহারার বর্ণনাও তাঁর খুবই মনোরম। ওজনে মণ দুই। লম্বায় পৌনে পাঁচ ফিট, রং কাল। মঙ্গোলিয়ান ছাপে নাক, মুখ। পুরু ঠোঁট, উঁচু দাঁত, চোখ দুটি এত ছোট যে ঐ বিরাট মুখে হাতীর চোখের মতই দেখায়। তদুপরি খুবই আন স্মার্ট। শাড়ীখানাও গুছিয়ে পরতে জানেন না।

এমন স্বরূপা ননীদি একা যদি কোন কাজে বোর্ড বা ডি, পি, আই অফিসে যান্—তবে কেউ ফিরেও চাইবে না তাঁর দিকে, কাজ করে দেওয়া তো দূরে থাক্। তাই স্কুলের ভেতরের কাজের জন্য যেমন কনিকা মিত্রের প্রয়োজন, তেমনি বাইরের কাজের জন্য প্রয়োজন রমা গুপ্তাকে।

কিন্তু এদের যোগ্য সমাদর ননীদি কখনই দেন্ না। তাঁর মধ্যে যে ইনফিরিয়ারিটি কম্প্লেক্স এর দহন জ্বালা ছিল—তার থেকে নিজেকে তিনি কখনই মুক্ত করতে পারেননি।

তাই কাজ হাসিল হওয়ার পরই তিনি তাদের সঙ্গে যে রূঢ় ব্যবহারটা করেন, সেটা তাদের ব্যথা দিতো।

কার্য্যোদ্ধারের পূর্বে ননীদির এক রূপ। কার্য্য সিদ্ধির পরবর্ত্তী কালের চেহারার সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। যখনই প্রয়োজন শেষ হয় বা নির্ভর করবার হেতু থাকে না, তখন এই দুই শিক্ষিকার অবস্থা দধিকর্ণের মত হয়। এইটে অন্যান্য শিক্ষিকাদের অসন্তোষের একটি কারণ।

যোগ্যতার দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ননীদিকে ছাড়িয়ে গেছে। বয়োজ্যেষ্ঠ্য বলেই তাঁকে প্রধানা শিক্ষিকার গদিটা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি যেন তা আজ বিলকুল ভুলে গিয়ে- নিজের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত।

কিন্তু ননীদির অবর্ত্তমানে তাঁর দ্বৈত স্বভাবের সমালোচনা শিক্ষিকারা করে থাকে। ছায়া বলে—কনিকা, তুই কেন ননীদির অফিসের হিসাব নিকাশ করে দিস্? কেনই বা চিঠি পত্র লিখে দিস্? কই সহকারী প্রধানার পদটি তো তোকে দিচ্ছেন না?

মায়া বলে—রমাই বা ননীদির হয়ে বোর্ড অফিসে এত ওকালতী করতে যাস্ কেন? তোকেও তো সহকারী প্রধানার পদটি দিচ্ছেন না। ওটা উনি কার জন্য রেখে দিয়েছেন বলতে পারিস?

কনিকা স্মিত হাস্যে উত্তর দেয়—সত্যি কথা বলতে কি আমি ঠিক ননীদির কাজ মনে করে ওসব এক্সট্রা কাজগুলি করি না। আমাদের পাড়ার, আমাদেরই উদ্বাস্তু মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ করে দেবার আশাতেই তাঁকে সাহায্য করে থাকি।

নতুবা তাঁর ব্যবহারে প্রতিবারই মনে হয় আর কখনও অমন

মধু ঢেলে ডাকলেও যাব না তাঁর কোন কাজে সহায়তা করতে। কিন্তু স্কুলের কথা মনে হলে না করে পারি না।

স্কুলের উন্নতি মানেই তো আমাদের সবার আনন্দ ও কৃতিত্ব। রচনা হেসে বলে—আমি কিন্তু কনিকার মত অতটা বদান্য বা পরোপকারী হতে পারি না। আমি যাই আমার নিজের স্বার্থে। সবে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়েছি। অভিজ্ঞতার ব্যাপারে প্রাচুর্য্য না হলে তো অন্য কোন স্কুলে প্রধানার পদটি দেবে না।

তাই এখান হতে শিক্ষানবিসি পর্ব শেষ করে বা কিছুটা অভিজ্ঞতার কোটিনে আবৃত হয়ে কেটে পড়ব অন্য কোন স্কুলে প্রধানার পদে। বোর্ড অফিসের সঙ্গে জানা শোনা থাকলে চাকরী পেতে সুবিধা। তাই যাই।

সুলেখা বলে—কণিকাটা একেবারেই বোকা, স্কুলের উন্নতিতে ননীদিরই লাভ। আমাদের আখেরে বিশেষ সুবিধা হবে না, কই আমাদের ডি, এর টাকা যে নিয়মিত পাচ্ছি না - সে বিষয়ে তিনি তো কখনও কোন তদ্বির করেন না। বা আমরা যাতে চাকরীতে পারমেনেন্ট্ হতে পারি—তারও চেষ্টা করেন না।

আমাদের মাইনা আজও ঠিক মত বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারি না। কিন্তু ননীদির পুরো মাইনে তো প্রতি মাসে তাঁর বাড়ীতে উঠে।

স্বরবালা বলে—আমাদের সেক্রেটারী মশায়ও হয়েছেন ননীদির উপযুক্ত। আমাদের সুখ সুবিধার দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, ননীদি যা বলেন তাই তাঁর কাছে বেদবাক্য। তাঁর সুখ সুবিধাই তিনি কেবল দেখেন। আমাদের যেন কোন দাবী বা অধিকার নেই।

আমরা যেন সব স্রোতের জলে ভেসে এসেছি। টিচারদের ভালমন্দ দেখাটা যেন তাঁর কাজ নয়। আমরা যারা পুরাতন তাদের চাকরীতে স্থায়ী না করে উনি পারেননি, কিন্তু নতুন যত টিচার আসছে তাদের কাউকেই উনি বোর্ডের অনুমোদিত পে স্কেল দিচ্ছেন

না বা কারো স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও তাদের নিয়োগ পত্রে উল্লেখ করছেন না। ফলে যথার্থই যোগ্য শিক্ষিকারা কেউ আর অনিশ্চয়তার জন্য স্কুলে আসছে না।

যোগ্যতা দেখে ননীদি শিক্ষিকা নিয়োগ করছেন না। নিয়োগ করছেন তাঁর দল ভারী করবেন কি ভাবে—সেই বুঝে। অর্থাৎ যারা অন্ধের মত ভাল মন্দ সব কাজে তাঁকে সমর্থন করবে—তাদেরই তিনি চাকরীতে স্থায়ী করছেন। তারা হয়ত তাঁর আত্মীয়া বা পরিচিত গণ্ডির মধ্যে পড়ে।

যতদিন চাকরীতে ননীদি স্থায়ী হন্‌নি, ততদিন তিনি তাঁর সহকর্মীদের সহযোগীতা দিয়ে এসেছেন সব কাজে। কারণ খুঁটি শক্ত করতে হলে যে তাদেরও সমর্থনের প্রয়োজন। সহকর্মীরা যদি রুখে দাঁড়ায়, তবে তাঁর চাকরীর ভিতও যে নড়ে যাবে।

কিন্তু চাকরীতে স্থায়ী হবার পর হতেই যেন তিনি অন্য মানুষ। বাইরের খোলসই বদলায়নি, ভিতরটাও যেন বদ্‌লে গেছে। নতুন যে সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছেন তিনিও খুব ভাল লোক। যে ঘাটে তিনি গেছেন, সে ঘাটই ডুবিয়ে এসেছেন। আর নিজের বিত্ত ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আধুনিক সমাজেও খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

এই যুগটার মাহাত্ম্যই তো এটা। কে কি ভাবে উপায় করছে, সেটাই বড় প্রশ্ন নয়। কার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কত মোটা—সেই মাপেই সামাজিক মান, সম্মান নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে।

সুতরাং ননীদি ও সেক্রেটারীর সঙ্গে যতই হৃদ্যতা গভীর হ'তে থাকে, ততই স্কুলের খাতে বোর্ড, ডি, পি, আই অফিস হতে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু টাকা গুলি যে কোথায় কর্পূরের মত উড়ে যাচ্ছে—তা তৃতীয় কেউ আর জানে না।

স্কুলের বাহ্যতঃ উন্নতি, শিক্ষিকা বা কেরানী, পিয়ন, দাড়োয়ান ইত্যাদিদের কোন রকম উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কারো কোন দাবী মিটাবার প্রশ্ন উঠলেই অর্থাভাবের একই কাঁদুনী

গান সবারই শুনতে হয় সেক্রেটারী ও প্রধানা শিক্ষিকার মুখ হতে। কোথাকার জল কোথায় যাচ্ছে—কেউ জানে না। তবে আঁচ করতে সবাই পারে।

কিন্তু এসব নোংরা ঘাটবার মত সময় বা মনোবৃত্তি কারো নেই। তাছাড়া অডিটার এসে প্রতি বছর চেক্ করে কাগজে কলমে হিসাব সব ঠিক আছে দেখাচ্ছে। স্কুল পরিদর্শকও কোথাও কোন ত্রুটি খুঁজে পান্ না।

বিজ্ঞানের শিক্ষিকা চারুপ্রভা। বিজ্ঞান বিভাগের জিনিষ কিনে আনা হলে চারুপ্রভাকে ডাকিয়ে ননীদি তাড়াতাড়ি বিল সই করিয়ে নেয়। কিন্তু যথার্থই কি কি জিনিষ আসলো, বা কোনটা কতটা আসলো—বিল সই করবার সময় তা মিলিয়ে দেখতে দেওয়া হয় না। তাই ৫০৲ টাকার জিনিষ এনে ৫০০৲ বিল করে বোর্ড বা ডি, পি, আই অফিস হতে টাকা পেতে খুব তেমন কষ্ট হয় না।

কেবল বিজ্ঞান নয়। লাইব্রেরী, ভূগোল, সাইকোলজী সব বিভাগেই একই দশা। মোটা বিলের টাকা আদায় হয়। কিন্তু স্কুলের ভাগ্যে কতটুকু সেই বাবদে জুটলো তার জন্য এই রথী, মহারথীদের দেখবার দরকার নেই। সব কিছুই ম্যানেজ করতে এরা ওস্তাদ।

সেক্রেটারীর বাড়ী আস্তে আস্তে শির উত্তোলন করে চলেছে। চারপাশেও হাত পা ছড়িয়ে যেন মনের আনন্দে বিরাজ করছে।

ননীদিরও উঠেছে ঠাসা বুনিয়াদের পাকা সুন্দর বাড়ী। কারো মনে প্রশ্ন যাতে না জাগে. তাই বাড়ীর প্রসঙ্গ উঠলেই ননীদি প্রথম কথাতেই বলে থাকেন—স্বামীর টাকায় এতদিনে বাড়ীটা তৈরী করলেন। কিন্তু যারা ননীদির ইতিহাস জানে, তারা জানে ননীদির স্বামী এমন কিছু কেষ্ট বিষ্টু ছিলেন না—যার জন্য এত বড় এত সুন্দর বাড়ী করবার মত টাকা রেখে যেতে পারেন।

শুধু তাই নয়, রিটায়ার করবার অনেক আগেই—তিনি গত

হয়েছেন। সুতরাং সঞ্চয়ের থলেতে যে তাঁর তেমন কিছু বেশী ছিল না, তা সহজেই ধরা যায়। কিন্তু তবু ননীদি ঐ কথাটি বলেই সাফাই গেয়ে থাকেন।

সেক্রেটারী মশায় বলে থাকেন তাঁর ব্যবসা নাকি ফেঁপে উঠেছে। তারই প্রমাণ আকাশচুম্বী প্রাসাদ। কিন্তু কেউ-ই সঠিক জানে না এই স্কুল ছাড়া তাঁর আর কি ব্যবসা কোথায় আছে—যার প্রক্রিয়ায় তাঁর টাকার থলি পাম্প করা ১০ নং বলের মত ফুলে উঠেছে।

যে সব পুরানো ঠোঁট কাটা শিক্ষিকারা এসব ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা করে থাকে, তাদের ননীদি মনে মনে সমীহ করে থাকেন। প্রকাশ্যেও তাদের বেশী ঘাটাতে চান্ না। তবে সুযোগ যদি পান তবে তাদের উচ্ছেদ করতে কার্পণ্য করেন না। যেমন—

সতীর বান্ধবী মেনকা এই স্কুলে চাকরী করত। সে ভাবল. আরও কিছু ডিগ্রী যদি বাড়ানো যায়, মন্দ কি? জ্ঞানার্জ্জনের তো শেষ নেই। তাই ননীদির সম্মতি নিয়েই সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হল—আরও একটি ডিগ্রী লাভের জন্য।

প্রস্তাবটা মেনকা একবার ননীদির কাছে করেছিল মাত্র। কিন্তু তারপর দেখা গেল মেনকার থেকে ননীদির আগ্রহই যেন বেশী। তিনিই তাকে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রেরণা দিতে সুরু করলেন। দু বছরের ছুটিও মেনকার জন্য মঞ্জুর করে দেবেন সেই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ননীদির এই আগ্রহের পশ্চাতে যে অন্য কোন অভিসন্ধি থাকতে পারে মেনকা তা বুঝতে পারেনি। সুলেখা কিন্তু বলেছিল—হঠাৎ ননীদি মেনকার এত শুভাকাঙ্ক্ষিণী হয়ে উঠলেন কেন বুঝতে পারছি না। উদ্দেশ্যটা খুব ভাল মনে হচ্ছে না।

শুনে হেসে চারু বলেছিল—তুমি সব কিছুতেই দুরভিসন্ধির গন্ধ পাও। হয়ত মেনকাকে তাঁর সহ প্রধানা শিক্ষিকা করবার মতলব। ঐ পদটা তো উনি এখনও শূন্য রেখেছেন। এবং ঐ পদের লোভে

অনেককে দিয়েই তিনি অনেক কিছু করিয়ে নিচ্ছেন। এবার হয়ত মেনকার প্রতি ননীদির প্রসন্ন দৃষ্টি পড়েছে। তাই মেনকার পদ-মর্য্যাদা বাড়াবার জন্যই তার গুণাগুণ বাড়াবার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

মায়া বল্ল—না যত সহজে কথাটা বলছিস্ চারু, উদ্দেশ্যটা কিন্তু তত শুভ নয়। কারণ এমনিতেই ননীদির জ্ঞানের দৌড় মেনকার থেকে কম। তারপর তার জ্ঞানের পরিধি আরও বাড়তে দিলে ননীদি যে তলিয়ে যাবে—এটা বুঝতে পারছিস্ না। এমনিতেই উনি কমপ্লেকসিটির রোগী।

তোরা যা-ই বলিস্ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কোথায় যেন কি একটা গোলমালে মনে হচ্ছে। তোরা যতই বলিস্, আমার কিন্তু ননীদির এতটা উদারতা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না।

ভূগোলের শিক্ষিকা রাধা বল্ল—তদুপরি পুরো দুটি বছরের ছুটি। দুদিনের ছুটি নিতে চাইলে যিনি হৈ চৈ বাঁধান, পুরো দু'বছরের ছুটি তিনি কিভাবে মঞ্জুর করছেন—এটা যেন অবিশ্বাস্য।

বয়োজ্যেষ্ঠা কল্পনাদি হেসে উত্তর দেন্—তোরা অত অধীর হচ্ছিস্ কেন? মেনকা ননীদির পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হল। এবার দেখাই যাক্ না তাঁর প্রতিশ্রুতি কতটা তিনি রাখেন।

মানুষের মনের নাগাল পাওয়া মুশকিল। হয়ত তাঁর শুভ বুদ্ধি দেখা দিয়েছে। নতুবা যে ননীদি কেউ পরীক্ষা দিচ্ছেন শুনলে রেগে যান্, ষ্টাডি লিভ্ পর্য্যন্ত মঞ্জুর করেন না, তিনি হঠাৎ ২ বছরের পুরো ছুটি দিয়ে যখন মেনকাকে উচ্চ শিক্ষার্থে সহায়তা করছেন, তখন আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

মেনকা সরল বিশ্বাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়ে ক্লাশ সুরু করেছে। পরবর্ত্তী স্কুল কমিটির মিটিং এ তার ছুটি মঞ্জুর হবার সম্ভাবনা ননীদি জানিয়েছেন।

মিটিং হল। মেনকার ছুটি নাকচ করা হল। তাকে পরবর্ত্তী

দিন হতে চাকরীতে জয়েন করার নির্দ্দেশ দেওয়া হল। সমস্ত মিটিং এ ননীদি মৌনীবাবা সেজে চুপ করে রইলেন।

মেনকার স্বপক্ষে একটি কথাও তিনি বল্লেন না। স্কুলের এতে ক্ষতি হবে, এ ধরণের একটা দৃষ্টান্ত থাকলে বছরে বছরে সকলেই এই সুযোগ নিতে চাইবে। ফলে নতুন শিক্ষিকাদের দ্বারা তেমন কাজ পাওয়াও যাবে না ইত্যাদি অজুহাত সেক্রেটারী কমিটির মিটিং এ তুলে ধরলেন।

শিক্ষিকা প্রতিনিধিদ্বয় মেনকার পক্ষ নিয়ে খুবই যুঝল, জানালো ননীদির প্রতিশ্রুতির কথা, কিন্তু ননীদি বেমালুম তা অস্বীকার করে জানালেন কেউ যদি জীবনে উন্নতি করতে চায়, তাতে যেমন তিনি অন্তরায় হতে পারেন না, তেমনি স্কুলের স্বার্থে বছরে বছরে যদি শিক্ষিকারা এভাবে ছুটি চায়, তা কি মঞ্জুর করা উচিত—এই প্রশ্ন তিনি রাখলেন কমিটির সামনে।

ননীদির মুখোস খুলে পড়ল। আঁচল চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা গেল না তাঁর ভেতরের মূর্ত্তিটিকে।

এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করল না মেনকা। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে মেনকা তার অভিষ্ট সিদ্ধ করবার জন্য সমস্ত মনোনিবেশ করল।

বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা বুঝল পুরানো শিক্ষিকাদের সরিয়ে দেবার এইটি একটি নতুন কৌশল মাত্র। ননীদির এই হীন চক্রান্তের প্রথম বলি হলো মেনকা। ঘৃণায় সতীর মন নিজ হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। সে-ও মেনকার সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরীতে ইস্তফা দিল। ছেদ পড়ল দুই বান্ধবীর চাকরী জীবনে।

৫

সতী চাকরীর খোঁজে আবার দরখাস্ত লেখা ও পাঠানো সুরু করল। এবার আর সহশিক্ষিকার পদ নয়। অভিজ্ঞতার ছাপে সতীর শিক্ষা ক্ষেত্রে ওজন বেড়েছে। তাই সে এবার প্রধানা শিক্ষিকার পদপ্রার্থী হল।

একদিন সতীকে কিছুটা বিস্মিত করে দিয়ে একটি স্কুলের সেক্রেটারী নিজেই সতীর বাসায় উপস্থিত। কলকাতা মহানগরীর সন্নিকটে এক বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী সতীকে পরবর্ত্তী দিনই চাকরীতে জয়েন করবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করেন।

তিনি বল্লেন—চাকরীতে ঢুকবার আগে সব খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়াই ভাল। নতুবা আপনি জয়েন করে ২।৪ দিন কাজ করেই চাকরী ছেড়ে দিলে স্কুলের বদনাম হবে।

আমার এক বন্ধুর বোনকে প্রধানা শিক্ষিকা পদে নিয়োগ পত্র দেওয়া হল। তিনি বল্লেন তিন মাসের নোটিশ না দিয়ে স্থায়ী চাকরী ছেড়ে তিনি আসতে পারবেন না—যদি ততদিন আমরা অপেক্ষা করি তাঁর জন্য—তবে তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।

সহশিক্ষিকার পদ হতে একেবারে প্রধানা শিক্ষিকার পদ দেওয়া হল। তবু এ ধরণের গড়িমসি। তবু ভাবলাম বন্ধুর বোন, জানাশোনাব মধ্যে কোন রকম বিপদ হবার সম্ভাবনা নেই—তাই অপেক্ষা করলাম তার জন্য তিন মাস।

প্রধানা শিক্ষিকা নিয়োগে বিপদ কি ?

তা আর বলেন কেন ? আজকাল তো কত শিক্ষক শিক্ষিকাই ধরা পড়ছেন যাঁরা যথার্থ ডিগ্রী না নিয়ে অন্যের ডিগ্রী দেখিয়ে বা জাল ডিগ্রী দেখিয়ে চাকরী নেন।

আপনার বন্ধুর বোন শেষ পর্যন্ত কি চাকরীতে জয়েন করেননি ?

সেই কথাই তো বলছি। দীর্ঘ তিন মাস প্রতীক্ষার পর তিনি চাকরীতে জয়েন করলেন এবং আগের স্কুলের চাকরীও হাতছাড়া করেননি। ছুটি নিয়ে এলেন আমার স্কুলের কাজটা দেখতে। ২।৪ দিন চাকরী করার পরেই চাকরী ছেড়ে চলে গেলেন।

অথচ তিনি পরিচিতা বলেই, কত আবেদন পত্রে যথার্থ অভিজ্ঞা শিক্ষিকা থাকা সত্ত্বেও ওঁনার জন্য কাউকে আমরা নিয়োগ করলাম না।

তিনি চলে গেলেন কেন ?

কেন আর ? আমাদের রেফিউজি স্কুল। ভাঙ্গা বাড়ী। চায়ের কাপের হাতলও ভাঙ্গা। উনি ছিলেন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল অমলা গার্লস স্কুলে।

শুনেছি ঐ স্কুলে বেয়ারারা সব পাগড়ী মাথায় চোখা চাপকান গায়ে তক্‌মা আটা ঝক্‌ঝকে কাপে ট্রেতে চা পরিবেশন করে শিক্ষিকাদের।

যিনি এসেছিলেন, সেই মহিলা কি ধনীর মেয়ে ?

না-না। তিনিও রেফিউজি মেয়ে। ভেবেছিলাম রেফিউজি মেয়ে যখন, তখন হয়ত এই রেফিউজি স্কুলের জন্য দরদ থাকবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখলাম হল উল্টা।

সেক্রেটারীর সেই মহিলার চাকরী ছাড়বার যে সব কারণ দেখালেন সতীর মন তা গ্রহণ করতে রাজী হল না। মনে হল কোথায় যেন কি একটা গোপন গলদ আছে। তাই সে প্রকৃত ব্যাপারটা জানবার জন্য প্রশ্ন করল—আপনাদের স্কুলের সম্বন্ধে কি সব খোলাখুলি বলতে চেয়েছিলেন, তাই এবার বলুন শুনি।

ব্যাপারটা হল আমাদের নতুন স্কুল। তাই কয়েকটা

ব্যাপারে আমরা রেখে ঢেকে কাজ করি—সে বিষয়ে আপনার সহায়তা আশা করব।

কি রকম ?

আমাদের স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ১৫০।১৭০ হবে। কিন্তু খাতায় কলমে দেখিয়ে থাকি ৩০০।৩৫০। এবং সেই ভাবে সব হিসাব দেখাই।

আমাদের স্কুলটা শহরতলীর এলাকাতে পড়ে। যদিও নাম হতে তা বোঝা যায় না। তাই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের মাইনা বোর্ড হতে আমরা পেয়ে থাকি। এই টাকা হতেই আমাদের শিক্ষিকাদের বেতন দিতে হয়।

তাছাড়া নবম, দশম শ্রেণী মিলে ৯।১০ জন ছাত্রী, এখানেও আমরা সংখ্যা বাড়িয়ে লিখে থাকি। এবং বেশীর ভাগ তপশীলী ভুক্ত ছাত্রী দেখিয়ে থাকি।

কারণ তপশীলী সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের সরকার হতে মাসিক বৃত্তি দিয়ে থাকে। এই ভাবেই আমাদের আয় বাড়াতে হয়।

তাছাড়া শিক্ষিকা সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেখাই। যদিও তারও সংখ্যা কম। অর্থাভাবে যোগ্য শিক্ষিকা পাওয়া যায় না। বোর্ড হতে একটা লাম্ গ্রাণ্ট পাওয়া যায়। শিক্ষিকাদের মাইনা ইত্যাদি তখন ঐ হিসাবে দেখানো হয়।

এ যে ঘোরতর মিথ্যের বেসাতী।

না করে উপায় ? একই অঞ্চলে আরও ৪।৫টা মেয়েদের হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। নতুন স্কুল। গার্জ্জেনরা মেয়েদের এই স্কুলে দিতে চায় না।

স্কুলের মাইনা দিতে হবে না বলে তবু হাতে পায়ে ধরে ছাত্রীদের ভর্ত্তি করাই। উপযুক্ত শিক্ষিকাও পাওয়া যায় না। কারণ বোর্ডের স্কেল আমরা দিতে পারি না।

এতগুলি স্কুল যখন রয়েছে, তখন নতুন এই স্কুল না খুল্‌লেই পারতেন।

এসব পার্টির দলাদলির ব্যাপার। আপনি ঠিক বুঝবেন না।

আপনাদের স্কুলের টাকা পয়সা নিয়মিত ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়ত ?

না। অত ঝঞ্ঝাট কে করবে ? আমাদের স্কুলের কেরাণীর কাছেই সব টাকা থাকে।

কিন্তু আইনতঃ প্রতিদিনকার সব আয় সহ সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্কে থাকবার কথা। এমন কি খরচের টাকা বাবদ ৫০ টাকার বেশী প্রধানা শিক্ষিকা বা সেক্রেটারীর কাছেও থাকতে পারে না।

আপনি ঠিকই বলেছেন। আইনে অবশ্য সবই ব্যাঙ্কে জমা দিতে বলা হয়েছে। তবে আমাদের যিনি কেরাণী, তিনি অবস্থাপন্ন লোক, আমার থেকেও অবস্থা তাঁর ভাল। সুতরাং টাকা চুরির ভয় নেই।

ভয় নেই এ কথা আপনি বল্লেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনও অঘটন ঘটে তার জন্য বোর্ড তো দায়ী করবে প্রধানা শিক্ষিকাকে। আপনারাও তো তখন তাঁকে রেহাই দেবেন না। এবং আইনের জাল হতে সে বেচারীও নিষ্কৃতি পাবে না।

তপশীলী ভুক্ত মেয়েদের নামে যে বৃত্তির টাকা আসে—তা আপনারা ছাত্রীদের দেন্ তো ?

এবার সেক্রেটারী উচ্চ হাস্যে উত্তর দিলেন—আপনি দেখছি একেবারেই অনভিজ্ঞ এসব ব্যাপারে।

প্রথমতঃ তপশীলী ভুক্ত একটি ছাত্রীও আমার স্কুলে নেই। আর যদি বা থাকতো, টাকা যদি তাদেরই দেব, তবে আমাদের স্কুল চলবে কি করে ?

এই দেখুন স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে স্কুলের ঘণ্টা বাজানো হতে

ক্লাশ নেওয়া, হিসাব রাখা—এক কথায় জুতা সেলাই হতে চণ্ডীপাঠ সবই আমাকে করতে হয়।

মর্ণিং স্কুল। এসব ঝামেলা করে রোজ আমার নিজের অফিসে যাওয়ার জন্য নাওয়া খাওয়ার সময়ও পাই না। যাক্ সব শুনলেন। আর একটি কথা বলে শেষ করব।

মাইনা কিন্তু আমরা সব মিলিয়ে ১৫০্ বেশী আপনাকে দিতে পারবো না। কিন্তু আপনি বোর্ডের স্কেল অনুসারে ৩৫০্ সই করবেন। বুঝতেই তো পারছেন নতুন স্কুল। আপনারা শিক্ষিতা মেয়েরা যদি একটু ত্যাগ স্বীকার না করেন, তবে দেশের উন্নতি হবে কি করে?

রেজাল্ট ভাল দেখাতে না পারলে কিন্তু স্কুল বন্ধ করে দেবে। সুতরাং আপনাকে রোজ বিকেলে যেয়ে আবার কোচিং ক্লাশ করতে হবে দশম শ্রেণীদের নিয়ে।

তেমন উপযুক্ত শিক্ষিকা নেই। তাই আপনাকেই ইংলিশ ইকোনোমিক্স, অঙ্ক, সংস্কৃত, বিজ্ঞান ইত্যাদি উপরের তিনটা ক্লাশে পড়াতে হবে।

তাছাড়া জানেনই তো স্কুলকে দাঁড় করাবার জন্য টাকার তাগাদায় আপনাকেই বোর্ডে ডি, পি, আই অফিসে ছুটোছুটি করতে হবে।

আপনি ছাড়া অন্য যে ৩।৪ জন শিক্ষিকা আছেন, তাঁদের শিক্ষা স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত। কিন্তু বোর্ডে আমরা তাদের গ্র্যাজুয়েট বলে চালাচ্ছি। নতুবা অনুমোদনও পাবো না, বা গ্র্যাজুয়েটের টাকাও পাবো না; এই সব টাকা দিয়েই তো স্কুল পরিচালনা করতে হবে।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব? বোর্ডের অনুমোদনের সময় বিভিন্ন পরীক্ষার সার্টিফিকেট বা ডিগ্রীর কপি পাঠাবার নির্দ্দেশ আছে। এসব আপনারা কোথায় পান?

সেক্রেটারী পুনরায় উচ্চ হাস্য সহকারে উত্তর দিলেন—আপনি

দেখছি এসব ব্যাপারে শিশুর মতই অজ্ঞ ও সরল। এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে একটা প্রতিষ্ঠান যখন দাঁড় করিয়েছি, তখন এইটুকু কি ম্যানেজ করতে পারবো না ?

বিস্মিত চোখে সতী প্রশ্ন করে—কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? তবে কি জাল সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী পাঠান ?

তাও কি সম্ভব ? আমাদের এজন্য বেশ খানিকটা কষ্ট করতে হয়েছে। মৃত গ্র্যাজুয়েট মহিলাদের সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী তাঁদের আত্মীয়দের থেকে স্বল্প মূল্যে কিনে থাকি। এবং ঐ নামেই অল্প শিক্ষিতা মহিলাদের আমার স্কুলে নতুন নামকরণ করে থাকি।

যে সব অভিভাবকদের থেকে এসব সার্টিফিকেট কিনে থাকি তাঁরা নিজেদের স্বার্থেই এসব প্রকাশ করে না। কারণ এতে আমাদের মত তাঁরাও আইনের চোখে সমান দোষী।

আর নব নিযুক্তা মহিলারা চাকরী পেয়ে এতই উপকৃত বোধ করে তাঁরাও এসব বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করে নিজেদের বিপদের জালে জড়াতে চান্ না।

যাক্ এ ব্যাপার নিয়ে আপনার কোন ভাবনার কারণ নেই। তবে উপরের ৩।৪টা ক্লাশের প্রায় সব সাবজেক্টই আপনাকে পড়াতে হবে। অর্থাভাবে পার্ট টাইমের জন্য কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিয়োগ করতে পারছি না।

সতীর কাছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল কেন সেক্রেটারীর বন্ধুর বোন ডবল প্রমোশন পেয়েও দুই দিনেই এই স্কুলের চাকরীতে ইস্তাফা দিলেন।

তার কারণ যে উর্দ্দি পরিহিত বয় বেয়ারা বা বিলেতী কাপের লোভে নয়,—মান, সম্ভ্রম, ইজ্জত বা চুরির অপবাদ হতে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

সতী জানালো তার দ্বারা এ ধরণের সমাজ সেবা বা স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের সহায়তা করা সম্ভব নয়।

সাধুতা ও সততার শিক্ষা কেন্দ্রগুলি আজ অসাধুতার কূট চক্রে পাপ কেন্দ্র হয়ে পড়েছে। চারিদিকের আবহাওয়া দেখে মনে হয় অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করতে করতে পশ্চিম বাংলার ষ্টেট বাসের মত আমাদের বিবেকও ব্রেক ডাউন হয়ে নিজেদের বিবেকের নির্দ্দেশে সুপথে পরিচালনা বোধ হয় আর কোন দিন সম্ভব হবে না।

৬

ইণ্টারভিউ দিতে সতী বীরভূমের একটা স্কুলে গেল। নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময়ে গিয়ে সে স্কুলে উপস্থিত হয়েছে। বিরাট জায়গা নিয়ে স্কুলের অসমাপ্ত দালানটি। উঁচু প্রাচীর স্কুল দালানের আব্রু রক্ষা করছে। তার ভিতরে বহু পুরানো লিচু, অশোক, আম, জাম, তাল, খেজুর, কাঁঠাল গাছ।

কেবল এই বিস্তৃর্ণ এলাকার দক্ষিণ দিকে এক জায়গায় একতলা পাকা খান্ কয়েক ঘর পাশাপাশি রয়েছে। তার পাশে কাঁচা মাটির ভিতের উপর বেড়া ও টিনের আরও কিছু ঘর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

ইঁটের গাঁথুনী দিয়ে যে কয়টা ঘর বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে—তাদের দুরাবস্থা বাইরে প্রচার করছে মানুষ গড়ার এই কারখানার আর্থিক অস্বচ্ছলতার সংবাদ।

তাই ইটের উপর সিমেণ্টের আবরণ কোথাও পড়েনি, দীর্ঘ দিন এভাবে উপেক্ষিত থাকায় কয়েকটি বর্ষার জল পেয়ে তার উপর নানা গাছ উঠবার উর্ব্বর ভূমি হয়েছে। শ্যাওলার এক শ্যামল আস্তরণও কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে।

সামনের বারান্দাতেও সিমেণ্টের ছোঁয়া না লাগায় তাতেও গজিয়ে উঠেছে ঘাস ও নানা ছোট ছোট জঙ্গলা গাছ।

বিদ্যালয়ের দাড়োয়ান যে অফিস ঘরটি খুলে সতীকে বসালো, সেই ঘরে খান কয়েক চেয়ার, খান দুই টেবিল, একটা টেবিলের উপর অতি পুরাণো একটি রেসিংটনের বিরাট একটা টাইপ মেশিন। খান কয়েক আলমারী দিয়ে ঐ ঘরটিকে পার্টিশন করে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। একটা টেবিলের উপর খান কয়েক কাপ ও একটা চায়ের

কেট্‌লী। চায়ের দাগে টেবিলের উপরে যেমনি অন্য রঙ লেগেছে, তেমনি আধোয়া কাপগুলিকে একমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে তাদের পুর্ব রঙের হদিস পাওয়া যায়। মিষ্টির স্বাদ পেয়ে পিঁপড়ের সারি চলেছে কাপগুলির দিকে।

ঘরের মেঝেতে যত্র তত্র কাগজ, ছিন্ন ভিন্ন সিগারেটের বাক্স, পোড়া সিগারেট ও দেশলাইয়ের কাঠি পড়ে রয়েছে। ঘরের শিলিং বেশ নীচু। বন্ধ জানলা গুলি খুলে দেওয়া সত্বেও কেমন যেন একটা ভাপ্‌সা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

স্কুল দালানের অদূরে দেখা গেল এক পাশে একটা ছোট্ট পুকুরও রয়েছে। পুকুরটার চারপাশে তাল, সুপারী, নারকেল গাছ।

সমস্ত জায়গাটা জুড়ে যে বিরাট বিরাট রকমারি প্রাচীন বৃক্ষগুলি রয়েছে, তাদের বিরাট গুঁড়ি শাখা প্রশাখায় বাস করছে হনুমান। গাছগুলি তাদেরই রাজত্বের অধীনে। ছোট বড় কম পক্ষে 'শ খানেক শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্বস্ত অনুচর হনুমানের দাপট। জায়গাটা সতীর ভালই লাগছিল।

গাছ হ'তে গাছে তাদের অবাধ গতি। কখনও দ্রুত লয়ে, কখনও বা ধীর মন্থর গতিতে সতীকে মুগ্ধ করছিল।

এত বড় বড় গাছ। তাদের ডাল পালায় সমস্ত আকাশটাই যেন ঢেকে রেখেছে। যে দিকে তাকান যায় সামনে পিছনে ডাইনে বামে বা উর্দ্ধে, অধেঃ সর্বত্র কেবল সবুজ রং এর ছড়াছড়ি। প্রাচীন গাছগুলি তাদের উচ্চতায় এবং শাখা প্রশাখায় এমন ভাবে নিজেদের বিস্তৃত করে রয়েছে যে—মনে হয় বিস্তৃর্ণ নীলাকাশের নীচে যেন সবুজ ত্রিপল পেতে রাখা হয়েছে।

তারই ফাঁকে ফাঁকে নীলের একটু আধটু আভা ঠিক্‌রে পড়ছে। সতী যেন প্রকৃতির কোলে বসে আছে।

যদিও বিদ্যালয়ের দীনতা আত্ম প্রকাশে লজ্জা বোধ করছে না,

কিন্তু সবুজ প্রাচীন গাছ গুলিতে হনুমানদের সরব নৃত্য যেমন উপভোগ্য, তেমনি আতঙ্কের কারণ।

এরাই নাকি মানুষের পূর্ব পুরুষ। এক একটি বড় বড় হনুমানের রকম দেখ্‌তে মন্দ লাগছিল না সতীর, আর তার মনের আনাচে কানাচে রকমারি কথা ভেসে উঠছিল।

শিশু শাবককে বুকে নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এক গাছ হতে অন্য গাছে হনুমান জননীরা ছুটে চলেছে। এদের মধ্যেও রয়েছে কি সুন্দর অপত্য স্নেহ। বিধাতার সৃষ্টি নৈপুণ্যের একটি মনোরম মডেল।

স্কুল পরিচালক মণ্ডলীর একজন সদস্য এসে দেখা করলেন সতীর সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর নেপালী জং বাহাদুর দাঁড়োয়ান ও মালি শঙ্করনাথ গিয়ে স্কুল প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীকে নিয়ে আসলো।

কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী নামে মাত্র সর্বেসর্বা ঐ সদস্য। তদুপরি তিনি ঐ বিদ্যালয়ের ছেলেদের বিভাগের প্রধান শিক্ষক ও প্রাতঃকালীন মেয়েদের বিভাগের অন্যতম সহশিক্ষক।

তিনজনই জাতে রেফিউজি। কিন্তু হতভাগ্য বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট ও বৃদ্ধ সেক্রেটারী কনট্রাকটারী ও ডাক্তারী পেশাতেও বয়ো বৃদ্ধ হয়েও আখেরে গুছিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু রেফিউজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে সদস্য মহাশয় সহরের বেশ ভাল জায়গায় বিরাট দ্বিতল দালান দাঁড় করিয়েছেন।

সদস্য মহাশয় জানালেন এই বিদ্যালয়ে শতকরা ৯৯·৯ জন রেফিউজি। তাই নিয়মিত মাইনা এরা দিতে পারে না। পরন্তু এদের অনেককেই বিনা বেতনে বা অর্দ্ধ বেতনে পড়বার অনুমতি দিতে হয়। এমন সব পরিবার হতে এরা আসছে হয়ত দুবেলা পেট ভরে দু মুঠো খেতেও পারে না।

এই সব সরল, সুবোধ মেয়েদের ও শিক্ষিকাদের সুপরিচালিত করবার জন্য একজন যথার্থই কর্মঠ পারদর্শিনী প্রধানা শিক্ষিকার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের আরও অনেক অভাব অভিযোগের কথা তিনি জানালেন। অর্থাভাবে বিদ্যালয় দালান সম্পূর্ণ হয়নি।

সতী জানালো আজকাল বোর্ড হতেই তো দালানের জন্য যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং স্কুল দালানের জন্য চিন্তার কোন কারণ তো থাকবার কথা নয়।

উত্তরে সদস্য ভোলানাথ বাবু জানালেন এই বিদ্যালয়ের অনেক শত্রু। তাই তাদের চক্রান্তে আজও বিদ্যালয় কোন রকম মোটা সাহায্য বোর্ড হতে পাচ্ছে না।

সতী প্রাক্তন প্রধানা শিক্ষিকার সম্বন্ধে জানতে চাইলে ভোলানাথ বল্লেন—তাঁর কথা বলবেন না। ভদ্রমহিলা মাসের মধ্যে ৪।৫ দিনও স্কুলে আসতেন না। অফিসের কাজও বাড়ীতে বসে করতেন।

আজ তাঁর ঠিকে ঝি আসেনি। তাই সাংসারিক কাজকর্ম করতে স্কুলে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কাল ছেলের অসুখ। পরশু স্বামী অসুস্থ, পরের দিন নিজেই হয়ত অসুস্থ। এসব নানা ঝামেলার জন্য মহিলাকে ছাড়াতে বাধ্য হলাম।

শুধু তাই নয়। মহিলা স্কুলের অনেক বই নিয়ে গেছেন। তিনি হিসাব পত্র বুঝিয়ে দিয়ে যাননি। তাছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এক লাইন ইংরেজী লিখতে জানেন না। স্কুলের চিঠি পত্র আমাদেরই লিখে দিতে হয় ইত্যাদি।

সতী প্রশ্ন করল—উনি এখন কোথায়?

—উনি এই সহরেরই অন্য একটি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা রূপে কাজ করছেন।

—আপনারা তবে তাঁকে স্কুলের বই বা হিসাব পত্র বুঝিয়ে দিয়ে যেতে বলছেন না কেন?

—ওঁনার হাত থেকে স্কুলকে মুক্ত করতে পেরেছি, এটাই যথেষ্ট।

তার বেশী আর কিছু চাই না। তত্বপরি এই অঞ্চলের বিদ্যালয় পরিদর্শিকা হচ্ছেন ওঁনার সতীর্থা।

এমনিতেই নানা ঝামেলায় এখনও আমরা বোর্ডের পুরো অনু-মোদন পাচ্ছি না। তত্বপরি এসব ব্যাপার নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করতে গেলে হয়ত তাঁর একটি কলমের খোঁচায় বিদ্যালয়টি উড়ে যাবে।

প্রাক্তন প্রধানা শিক্ষিকা সম্বন্ধে এদের এই ধরণের মন্তব্যগুলি বিনা বিচারে মেনে নিতে সতীর মন চাইল না। যদি এদের কথাই সত্য হবে, তবে একই সহরের উচ্চমানের স্কুলের চাকরীতে উনি কি করে বহাল আছেন।

তত্বপরি যে স্কুলে তিনি আছেন, সেই স্কুলটির ছাত্রী সংখ্যাও এই স্কুলের চারগুণ। তাছাড়া বহু কালের পুরানো বিদ্যালয়। এক কথায় যাকে ঐ সহরের অন্যতম একটি আদর্শ স্কুল বলা যায়।

সতীর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রীত হয়ে তাঁরা তিন জনই বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানালেন সতীকে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে।

কথা প্রসঙ্গে ভোলানাথবাবু আরও বলেছিলেন—এই স্কুলের ছাত্রীরা খুব গরীব। তাদের পক্ষে প্রাইভেট টিউটার রাখা বা টিউ-টোরিয়েল ক্লাসে যেয়ে পড়াশুনায় সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়।

তাই বিকেলে স্কুল ফ্যাইন্যালের ছাত্রীদের কোচিং ক্লাশ হয়। স্কুলের শিক্ষিকারাই পালা করে এক একদিন ২।৩টা বিষয় পড়িয়ে থাকে।

তিনি আরও জানালেন এই ব্যবস্থায় ছাত্রীরা ও স্কুল উপকৃত হয়। কিন্তু প্রাক্তন প্রধানা তাঁর সময়ে এ ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে সেই বছরে বহু ছাত্রী ফেল করে। স্কুলের পাশের হারও কমে যায়। তাই সতীকে তাঁরা তিন জনেই অনুরোধ জানালেন এই প্রতিষ্ঠানকে উজ্জীবিত করে একটি আদর্শ শিক্ষালয় গড়ে তুলতে।

প্রথম দর্শনে স্কুলের পরিবেশটা সতীকে আকৃষ্ট করেছিল। তারপর ছাত্রীরা প্রায় সকলেই দরিদ্র রেফিউজী—এই আবেদনও সতীর কোমল মনকে স্পর্শ করেছিল। তাই সে নতুন উৎসাহ, উদ্যম নিয়ে এই স্কুলে চাকরী করতে আসে।

স্কুলের নিকটেই সতীর জন্য একটি বাড়ীর দোতালা ভাড়া করা হয়েছিল। সতীর বাড়ীটিও ভারী সুন্দর জায়গায়। খোলা ছাদে বসে দেখা যায় একদিকে প্রশস্ত রাজপথ। অন্য দিকে পায়ে চলা সরু পথ। পুকুর একটা তার বাড়ীর পাশেই। তারই পাড়ে কয়েকটি খেজুড় গাছ। সহরে থেকেও খানিকটা শহরতলীর পরিবেশ যেমন মনোরম, তেমনি উপভোগ্য।

প্রথম দিন কোচিং ক্লাশ শেষ করে সতী যখন তার কোয়াটারে বসে চা পান করছিল, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়বার শব্দে সতীর ঝি গিয়ে দরজা খুলে আগন্তুককে দেখে, সতীকে এসে জানায় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা এসেছেন।

ঝিটি স্থানীয়। সুতরাং এই স্কুলের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সব শিক্ষিকাকেই সে চেনে। ঝির মুখে প্রাক্তন প্রধানা শিক্ষিকার আগমনের খবর শুনে সতী কিছু বিস্মিত হলো। তাঁকে ভেতরে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিল।

মহিলা কক্ষে ঢুকেই বল্লেন—আমায় মাপ করবেন। আপনার নামে আমার এক ছাত্রী আছে। তাই আপনার নাম শুনে সন্দেহ হয়েছিল, হয়ত সেই ছাত্রীই এসেছে।

তাই এসেছিলাম তার সঙ্গে দেখা করে তাকে সতর্ক করে দিতে। ভুল করেছি। আমি যাই।

নাই বা হলাম আমি আপনার ছাত্রী। ভুল করে যখন এসেই পড়েছেন, তখন না হয় আমার আতিথ্যটুকু গ্রহণ করুন। আমি নবাগতা। আপনার অভিজ্ঞতার কষ্ঠি পাথরের মাধ্যমে আমাকেও না হয় যাচাই করতে সাহায্য করুন।

চা পানের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ পরিচয় হল। তারপর সুচিত্রা দেবী সতীর স্কুলের সম্বন্ধে সব কাহিনী এক এক করে শোনালেন। সে কাহিনী সতীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করল।

অবশ্য সুচিত্রা দেবী সম্বন্ধে যে সব কথা স্কুল কর্তৃপক্ষর মুখ থেকে শুনেছিল, তা যে সর্ব্বৈব মিথ্যে তা সতীর তখনই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন সুচিত্রা দেবীর থেকে সব শুনে সুচিত্রার অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর নির্ভর করেই সতীকে চলতে হবে—সে বুঝলো।

সুচিত্রা দেবী ফিরে গেলেন। কিন্তু সতীর মনে ভয় ও অবিশ্বাসের এক ছাপ রেখে গেলেন। সুচিত্রা দেবী বলেছিলেন—আপনি কতদিন কাজ করতে পারবেন জানি না। তবে জানবেন এখানে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।

কেউ কখনো শুনেছে যে স্কুলের সেক্রেটারী বা প্রেসিডেণ্ট মোটা অঙ্কের মাসোহারা স্কুল থেকে পেয়ে থাকে? অবশ্য এই অঙ্কের টাকাটা মিসিলিনিয়াসের খাতে ধরা হয়। নতুবা স্কুল পরিদর্শিকা যে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবে।

নামে মাত্র এই দুই পদের জন্য দুই বৃদ্ধকে বসানো হয়েছে। কিন্তু ভোলানাথবাবুই স্কুলের সর্বেসর্বা দশাননের মত দশ মুখ ব্যাদন করে দশ দিক থেকে উদর পূর্ত্তি করবার ব্যবস্থা পাকা করছেন।

তিনি আবার এই স্কুলের ছেলেদের বিভাগের প্রধান। কিন্তু মর্ণিং এ তিনি মেয়েদের স্কুলে ষ্টাফ কম বলে সহায়তা করবার নাম করে—স্কুলের পয়সায় পরিষদবর্গ সহ চা ও জলখাবারের নামে একটা বড় আড্ডা জমায়েত করেন। এবং নানা রকম চরিত্রের লোকের তাঁর কাছে সমাগম হয়ে থাকে।

ভোলানাথবাবুর স্যাগরেদ এইসব অপদেবতারা তাদের সাঙ্গো-পাঙ্গ নিয়ে এই স্কুলের পয়সায় বেশ গুলজার করে বসে আম্রকুঞ্জে। ভোলানাথবাবুর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করা।

মর্ণিং সেকশনে পড়াবার অছিলা করে মোটা একটা এলাউন্স তিনি মেয়েদের বিভাগ থেকে নেন্। কিন্তু বছরান্তে ৬ দিনও হয়ত ক্লাশে যান না। ছাত্রীরা তখন হৈ চৈ স্বুরু করে। বাধ্য হয়ে প্রধানা শিক্ষিকাকেই অন্য কোন শিক্ষিকার মাধ্যমে ক্লাশটা ম্যানেজ করতে হয়।

বিকেলেও তিনি কোচিং ক্লাশ নেবেন এই অছিলায় আসেন রোজই। কিন্তু সকালের মত ক্লাশ কখনই নেন না। পরন্তু সেই সময় আম্রকুঞ্জে পারিষদবর্গ সহ কিসের গোপন সভা করেন—তা তাঁরাই জানেন।

কোচিং ক্লাশটা একটা ভাওতা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য আপনাকে সহরের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। যাতে আপনি কারো সাথে মিশবার স্বুযোগ না পান বা এদের কীর্ত্তি কলাপ আপনার কর্ণগোচর না হয়। এবং আপনি অন্ধের মত চোখে টুলি পরে ভোলানাথবাবু যে ভাবে আপনাকে চালিত করবে—সেই ভাবেই চলবেন। এবং কোচিং ক্লাশের নামে এই ফার্সটা যদি না হয়, তবে চায়ের খরচটা আপনার বিভাগের মিসিলিনিয়াসের খাতে লিখবে কি করে ?

ছেলেদের বিভাগের হিসাবে এসব-অপচয় ঢাকবার কিছুমাত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁর সব পাপের সাক্ষ্য বহন করবে মেয়েদের বিভাগ। এবং প্রয়োজন হলে মিসিলিনিয়াসের মোটা অঙ্ক দেখিয়ে আপনাকেই আবার উচ্ছেদ করা যাবে এই অজুহাতে যে আপনি স্কুলের টাকা আত্মসাৎ করছেন।

স্কুলের যিনি কেরাণী, তিনি ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগেরই কেরাণী। তিনি আবার ভোলানাথবাবুরই সাগরেদ। স্বুতরাং তাঁর সম্বন্ধেও হুসিয়ার হয়ে চলবেন। তাঁকে এক কথায় ভোলানাথের চর বলা যায়। তাঁর সহকারী রূপে যে বি, কম ছাত্রটি আছে, সেই ছাত্রটিই যথার্থ স্কুলের কাজ কর্ম করে।

তরুণ বেচারী বড়ই দুঃস্থ পরিবারের ছেলে। বড় ভাল ছেলে।

তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে নানা রকম অন্যায় কাজকর্ম করাবার চেষ্টা করা হয়। তরুণ নেহাৎই তরুণ।

তারমধ্যে সততা, সাধুতা আদর্শ এখনও আছে। অভাবের চাপে তা এখনও চাপা পড়ে যায়নি। যখন কোন রকম অন্যায় কাজ করতে তাকে চাপ দেওয়া হয়, তখন সে বেঁকে বসে।

তখন ভোলানাথবাবু এবং তাঁর সাগরেদ কেরাণী নন্দী মিলে তরুণের পিঠ চাপড়ে তার ক্রোধকে দমন করতে চেষ্টা করে। নন্দীর গুণাগুণ অনেক। তিনি যেখানেই চাকরী করেছেন তহবিল তছরূপ করার অপরাধে তাঁর চাকরী গেছে। এই কারণেই তিনি ভোলানাথ-বাবুর অকৃত্রিম বন্ধু।

আস্তে আস্তে স্কুলের অনেক কিছুই সতীর সামনে প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে। অনেক খবরাখবরই তার কানে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায় রোজ তারই সহকর্মী ও সহরের আরও অনেকে। এমন কি স্কুল পরিদর্শিকার অফিস হতেও পায় অনেক খবর।

ভোলানাথবাবুর সব রকম গুণই আছে। সুচিত্রা দেবীর পূর্ব-বর্ত্তীণীর সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভাবন করেছিল ভোলানাথ যার জন্য মহিলা চাকরী ছেড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন।

এই কারণে সুচিত্রার মত অনেকেই ভোলানাথবাবু সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল সতীকে। আস্তে আস্তে ঘটনার মাধ্যমে অনেক কিছুর সত্যতাই যেন যাচাই হয়ে যেতে লাগলো।

সহরের উপরেই স্কুল। তবু বোর্ডের নির্দ্দেশানুসারে দৈনিক স্কুলের আয় কোন ব্যাঙ্কে জমা পড়ে না। অথচ সেই টাকা যে কার কাছে থাকে—তা সতী জানে না।

প্রতিদিনের কালেকশন্ হওয়ার পর ভোলানাথের নন্দী আসে সতীর সই নিতে। সতী এদের সম্বন্ধে এত শুনেছে যে অতি সন্তর্পণে গুটি গুটি পা বাড়িয়ে সে-ও চলেছে।

সতী তাকে বলে কালেকশনের টাকা যখন আমার কাছে থাকে না বা ব্যাঙ্কেও আপনারা তা রাখবেন না, তখন টাকা যার কাছে, খাতায় তিনিই সই দেবেন। এই গুরু দায়িত্ব আইনতঃ আমি নিতে পারি না।

তারপর দৈনন্দিন ব্যয়ের খাতে সতীর সই এর প্রয়োজন। প্রায় প্রতিদিনই মিসিলিনিয়াসের খাতে মোটা অঙ্ক লেখা হচ্ছে। অথচ যথার্থই এই অঙ্কের টাকাটা দিয়ে কি করা হয় তার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। প্রশ্ন করে উত্তর শোনা যায় সকাল বিকাল চা, জলখাবারের খরচ।

সতী বলে—এই চা, জলখাবার তো স্কুলের কোন শিক্ষিকা বা স্কুল কমিঠির কেউ খান্ না। সুতরাং বাইরের কে কার কাছে কি স্বার্থে এসেছে, তাকে যদি খাওয়াতে হয় তবে যাঁর কাছে এসেছে তাঁর স্কুলের মিসিলিনিয়াসের খরচটা লেখাই তো উচিত। আমি জানি না কে আমার স্কুলের খরচে দৈনিক ছুবেলা এত খেয়ে যাচ্ছে। অথচ আমার সহকর্মীদের তো কখনও এক কাপ চা-ও স্কুল হতে বিনা পয়সায় দেওয়া হয় না।

সতীকে প্রতিদিনই ছুবেলা গৌরী সেনের টাকায় চা, মিষ্টি অফার করা হয়। কিন্তু এই চা খাবারের ইতিবৃত্ত স্কুলে ঢুকবার সুরুতেই সতীর জানা হয়েছে। সুতরাং ঐ চা পান করে তার মুখ বন্ধ করবার সুযোগ সতী সুরু হতেই দেয়নি। বাইরে চা সে পান করে না। এই অজুহাতে কখনই সে ভোলানাথকে তাকে ভোলাবার কোন সুযোগ দেয় নাই।

স্কুলের মালি যখন রাত্রে সতীর কোয়ার্টার পাহারা দেবার জন্য শুতে আসতো, তার থেকেও সতী ভোলানাথ ও নন্দীদলের অনেক তথ্যই জানতে পেরেছে।

সদাহাস্যময় সরল গ্রাম্য পশ্চিমা শঙ্করনাথ বলত—দিদিমণি, এই চোখে দেখেছি অনেক, এই কানে শুনেছি তারও বেশী। সব

কিছুর সাক্ষী আমি। তবে সময়ে সময়ে একেবারে চুপ করেও থাকতে পারিনি, যখন দেখেছি কোন মায়ের জাতের প্রতি অসম্মান।

ছোট মুখে বড় কথা বের হয়ে পড়ল—এজন্য মাপ করবেন দিদিমণি। তবে আমার চীৎকারে কাজ হয়েছে। আমরা ছোট জাতের হতে পারি। ছোট কাজ করতে পারি,—তবে ধর্ম আমাদের কাছে সব চেয়ে বড়। এজন্য আমরা জান কবুল করতে পারি।

তাই বলছি দিদিমণি। আমি না ছাড়লে, আমাকে এখানের চাকরী হতে কেউ ছাড়াতে সাহস পাবে না। কারণ আমি যে ভেতরের কথা সব ফাঁস করে দিতে পারি।

তবে আপনি দিদিমণি, কড়া আছেন। টিকে যদি থাকতে পারেন, স্কুলটা দাঁড়াবে। নতুবা ডুবে যাবে। আপনার আগে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই ভাল। কিন্তু তাঁরা প্রথমে বোঝেননি বড়বাবুর চক্রান্ত।

তাই একটু আধটু আরাম বা সুযোগ দিয়ে, তাঁদের মুখ বন্ধ করে চালিয়েছেন তাঁর যথেচ্ছাচারের রথ। নামেই দিদিমণিরা প্রধানা শিক্ষিকা ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা সব ছিল বড়বাবুর। আপনি এখনও তা হতে দেন্‌নি।

এমন কি তিনি মেয়েদের প্রমোশন দেন অভিভাবকদের থেকে টাকা নিয়ে। বড় দিদিমণিরা তার কিছুই জানতেন না। কিন্তু অভিভাবকরা জানতেন এ টাকা বড় দিদিমণিই নিচ্ছেন। এই আমি শর্মা কেবল জানি—সেই টাকা কার পকেটে যায়।

এমনি ধারা নানা রকম খবরই সতীর কানে এসে পৌঁছাতে লাগল। তাই সতী প্রতিদিন বিকেলে কোচিং ক্লাশে উপস্থিত থাকতো, ছাত্রীদের ও যে ২।১ জন শিক্ষিকা আসতেন তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বের জন্য।

সতী আসার পর ছাত্রীদের প্রমোশন হল। টিচার্স মিটিং এ সতী জানালে, যে যে ছাত্রীকে প্রমোশন দেওয়া যেতে পারে, একটা

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধরে এখনই তা স্থির করতে হবে। এরপর চিঠি বা সুপারিশে আর কাউকে উঠানো সম্ভব হবে না।

ভোলানাথ ব্যতীত সকলেই এ ব্যাপারে একমত। ভোলানাথ নানা ওজর আপত্তি তুলে বিশেষ কয়েকজনের জন্য ব্যতিক্রম করতে ইচ্ছুক।

সতী কঠোর স্বরে বলে—স্কুল পরিচালনার সব দায় দায়িত্ব যখন আমি নিয়েছি, প্রমোশনের ব্যাপারে আমি আমার সহকর্মীদের পরামর্শ মতই কাজ করব।

বাইরের লোকের উপরোধের ঢেঁকি গিলতে আমি রাজী নই। শুধু তাই নয়। প্রয়োজনীয় রেজিষ্টারী খাতাপত্র সতী তার কোয়ার্টারে নিয়ে যেতো, যাতে সতীর অবর্ত্তমানে কারো হতে টাকা নিয়ে এইসব খাতার নামের পাশে নম্বরের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে না পারে।

এবার ভোলানাথের এই উপরি রোজগারটা বন্ধ হয়ে গেল। সহকর্মীদের থেকে সতী খবর পেলো, তাদের অনেককেই চাকরীতে নিয়োগ করা হয়েছে নিয়োগপত্র ছাড়া।

ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে তাদের চাকরী যাবার সম্ভাবনা আছে। প্রয়োজনে এদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতি অনেক অন্যায় অবিচার করা হয়। স্থায়ী টিচারদের সুযোগ সুবিধাও এসব টীচাররা পায় না। মাইনাও বছরের পর বছর চাকরী করেও বাড়ে না, বা চাকরীতে স্থায়ী করা হয় না।

কিন্তু তাদের পক্ষে ম্যানেজিং কমিটিতে লড়বে কে ? শিক্ষিকাদের প্রতিনিধি স্বরূপ ম্যানেজিং কমিটিতে যে আছে—যোগ্যতায় সে সব শিক্ষিকার নীচে। এক কথায় তার যা বিদ্যা তা প্রাইমারীর উপরে নয়। এই ধরণের হাই স্কুলে এই যোগ্যতায় যে গুণ থাকলে টিকে থাকা তার পক্ষে সম্ভব, তা তার আছে।

বয়সে অবশ্য সে সবার চেয়ে এমন কি সতীর থেকেও বড়।

নাম তার স্নেহ। যদিও স্বভাব চরিত্রে তার স্নেহের পরিবর্তে কাঠিন্যই প্রকাশ পায় বেশী। কে তাকে প্রতিনিধি করেছে তাও শিক্ষিকারা জানে না।

শিক্ষিকাদের যে কেবলমাত্র চাকরীর স্থায়িত্ব নেই, তা নয়, চাকরীর স্বীকৃতি না থাকায় তারা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ইন্‌ক্রিমেন্ট, ছুটি ইত্যাদি কোন সুযোগই পায় না।

যারা এই স্কুলের শিক্ষিকা, তারা সকলেই অল্প বয়স্কা। কেউ কেউ বি, এ বা বি, এস, সি পাশ করে ঢুকেছে, কেউ কেউ বা চাকরী করতে করতে এম, এ পড়েছে।

তাদের বোর্ডের অনুমোদিত বেতনও দেওয়া হয় না। বেতনও আবার এক সঙ্গে সব টাকা দেওয়া হয় না। যদিও মুষ্টিমেয় টাকাই তাদের দেওয়া হয়। মাসের প্রথমেই বোর্ডের অনুমোদিত অঙ্কের পাশে তাদের দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়ে নেয় নন্দী। তারপর কিস্তিতে কিস্তিতে ২০৲।২৫৲।৩০৲ এইভাবে টাকা দিয়ে থাকে।

সহকর্মীরাও জানায় তাদের অনেক অভাব, অভিযোগ ও তাদের প্রতি অন্যায়ের কথা—যার প্রতিকার দীর্ঘদিন ধরেও হয়নি বা হবার সম্ভাবনা নেই।

এইভাবে ছোট খাট নানা ঘটনার মাধ্যমে সতীর এই স্কুল সম্বন্ধে নিত্যি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হতে লাগল। অবশেষে ছেলেদের সেক্‌শনের কয়েকজন মাষ্টারমশায়ও জানায় ভোলানাথবাবুর সম্বন্ধে নানা কথা।

তাঁর ডিগ্রী নিয়েও নাকি গোলমাল কিছু উঠেছিল। শোনা যায় তিনি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। যে হতভাগ্যের ডিগ্রী ভাঙ্গিয়ে তিনি প্রধানের গদীতে বসেছেন—তিনি অমরধামে চলে গেছেন। উভয়ের নামের কিছুটা অবশ্য সামঞ্জস্য আছে। পুরো নয়, তবে প্রয়োজনের তাগিদে নামটা একটু অন্য ধরণের করে নিতে বাধা কি? শুধু কি তাই? উভয়ের পিতৃনাম বা জন্মভূমি কিন্তু এক নয়।

এজন্য ভোনাথবাবুর বৃদ্ধ পিতার উপর নাকি নির্য্যাতন হয়েছে অনেক। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি নাম বদলাতে রাজী নন। এজন্য নাকি তাঁকে পাগল এই মিথ্যে অজুহাতে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল।

বার বার মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েও এই সামান্য ব্যাপারটা চাপা দেওয়া যখন ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল, দুষ্ট লোকেরা বলে তখন হঠাৎ ভোলানাথবাবুর পিতার অন্তর্ধান এবং তারপর মৃত্যু সংবাদ রটনার মধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে।

অবশ্য দুষ্টু লোকদের কথার সত্যতা সতী যাচাই করতে যাবে না। তবে এমন লোকের দুষ্কর্মের মলিন থাবা হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে সে সচেষ্ট হয়ে পড়ল।

ছোট খাট অনেক ব্যাপারই এর মধ্যে ঘটে গেছে—যার মাধ্যমে সতীর সঙ্গে ভোলানাথ ও নন্দীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিতে সুরু করেছে। সুচিত্রা দেবী এই স্কুলের অনেক অধ্যায়ই সতীর সামনে খুলে ধরেছিলেন।

ভোলানাথ যেন সতীর চোখে দেখতে পেল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ছাপ। বুঝতে পারল ভাল মানুষের মুখোস পরেও যেন সতীর কাছে তাদের আসল রূপটা ধরা পড়ে গেছে। বুঝলো সুচিত্রা দেবীই তার কারণ।

তাই সতীকে সুচিত্রার থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য একদিন সতীর নাম করে মিথ্যে অনেক কিছু ভোলানাথ সুচিত্রার স্বামীকে শুনিয়ে দিল।

তারপর হতে সুচিত্রার আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এ খবর যখন সতীর কাছে পৌঁছালো, সতী তখন ঐ স্কুলের জালে ঊর্ননাভের মত এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, সেই জাল ছিঁড়ে পালাবার পথের সন্ধানে ব্যস্ত।

ক্লাইমেক্স দেখা দিল সরস্বতী পূজাকে উপলক্ষ করে। মর্ণিং ও

ডে সেক্‌সনের সব শিক্ষিকা ও শিক্ষকরা মিলিত হয়ে পূজা কমিটি তৈরী হল। মেয়েদের পূজা কমিটির দায়িত্ব সতী ও তার সহশিক্ষিকার উপর। আর ছেলেদের স্কুলের দায়িত্ব ভোলানাথ ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে।

ছাত্রীদের থেকে চাঁদা তোলা হয়েছে। পূজার দিন ঘনিয়ে এল, কিন্তু দেখা গেল পূজার বাজার পত্র কিছুই হচ্ছে না। অথচ ছাত্রীদের সংগৃহীত সব টাকা ভোলানাথ কায়দা করে নন্দীর কাছে জমা রেখেছিল।

সরলা সতী বোঝেনি কেরাণী নন্দীর কাছে এই টাকা জমা দেবার পিছনে কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি ছিল। সে ভেবেছিল সারাদিনই তো প্রায় সতী স্কুলে থাকে, এতটা টাকা খালি কোয়ার্টারে ফেলে আসা নিরাপদ নয়, তাই বোধ হয় নন্দীর কাছে টাকা গুলি জমা রাখার প্রস্তাব করেছে ভোলানাথ।

পূজার আগের দিন ছাত্রীরা ও সহশিক্ষিকারা জানালো—এবার আমরা স্বতন্ত্র পূজা করব, সুতরাং চাঁদার টাকা যেন তাদের কাছে দেওয়া হয়।

এই কথা শুনে সতী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—তোমরা এ রকম প্রস্তাব করছ কেন? স্বতন্ত্র পূজা তো নিশ্চয়ই হবে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা কখনই যুগ্ম পূজা করতে পারে না। তা সে কোন প্রকারেই অনুমোদনও করতে পারে না।

সহশিক্ষিকা সাগরিকা বল্ল—দিদি, ভোলানাথ প্রথম হতেই আপনার ষ্ট্রং পার্সনেলিটিকে সমীহ করে চলেছে। এবং কয়েকবারই দেখেছে তার অন্যায়ে অন্যান্য প্রধানা শিক্ষিকাদের মত আপনি নির্বাক থাকেননি, পরন্তু প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তাই এই স্কুলের এই অদ্ভুত যে ট্রেডিশন, যে সম্বন্ধে আপনাকে এবার আর অবহিত না করে, কৌশলে আমাদের কালেক্‌শনের

টাকাটা হাত করে নিয়েছে। এবারেও দেখবেন সরস্বতী পূজার নামে সে কি ভাবে পুকুর চুরি করে।

এই ভাবে কেবল সাগরিকা নয়, এক এক করে সব শিক্ষিকাই তাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সবিস্তারে জানালো। এদের থেকে যে তথ্য সতী জানতে পারলো, শুনে সে স্তম্ভিত হল।

সে শিক্ষিকাদের অনুযোগ করল কেন তারা এ সম্বন্ধে তাকে পূর্বেই ওয়াকিবহাল করেনি? তবে এমন অন্যায়ের জালে সে কোন প্রকারেই জড়িয়ে পড়ত না।

সতী উপলব্ধি করল কায়দা করে ভোলানাথ মেয়েদের সেকশনের টাকাটা হাত করেছে। এরপর আর কোন প্রকারেই সেই টাকার থলি সে হাতছাড়া করবে না।

সতী সেইদিনই ভোলানাথের কাছে মেয়েদের বিভাগের পূজা কমিটির আদায়ী টাকা চাইল পূজার বাজার ছাত্রীরা করবে এই কারণে।

সে টাকা তো এক সঙ্গে জমা হয়েছে। এই স্কুলে প্রতি বছর পূজা এক সঙ্গে হয়। সেই জন্য সেই ভাবে মূর্ত্তি ও অন্যান্য সব কিছুর অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আপনি তাতো আমাকে জানাননি। এটা সহশিক্ষার কেন্দ্র নয়। সুতরাং দুই স্কুলের পূজা কেন এক সঙ্গে হবে? স্কুল বিল্ডিং এক হতে পারে। কিন্তু এত প্রশস্ত জায়গার মধ্যে মেয়েরা অন্যত্র আলাদা করে পূজা করবে।

তা অন্ততঃ এ বছর হয় না। কারণ আমি পূর্বাহ্নেই সেই ভাবে অর্ডার দিয়েছি। এখন আর তার রদ বদল কোন প্রকারে সম্ভব নয়।

কিন্তু এভাবে ছাত্রীদের টাকা থেকে ছাত্রীরা সর্বতভাবে বঞ্চিত হয়, তা আমি চাই না। শুনেছি প্রতি বছর পূজার প্রসাদটুকুও

তাদের ভাগ্যে জোটে না। অথচ যা কিছু কাজ ছাত্রী সহশিক্ষিকারাই করে থাকে।

তা কি করে হয়? প্রতিবার আমি সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্রসাদ বিতরণ করে থাকি।

সতী বুঝল ভোলানাথ প্রতিটি মিথ্যে কথা বলে নিজের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করছে। তার সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভোলানাথের সঙ্গে তর্কাতর্কি হল। সতী বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারল যে ভোলানাথ তার অভিষ্ট সিদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর।

কিন্তু সতীর চোখের সামনে এই ভাবে অন্যায় হয়ে যাবে, সে ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে থাকবে, তা কখনো সম্ভব নয়। বিশেষ করে সতীর মত স্বাধীনচেতা মেয়ের পক্ষে তা কোন প্রকারেই সহনীয় নয়। মনে মনে সতী তার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছে।

সে একটি পদত্যাগ পত্র লিখে মালী শঙ্করনাথ মারফৎ স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দিল। অপর একটি পদত্যাগ পত্র ডাক যোগে রেজিষ্টারী করে পাঠাল। এবং নিজেও ভোলানাথকে জানালো সে কলকাতায় চলে যাচ্ছে ভাসানের পরদিন যেদিন সরস্বতী পূজা উপলক্ষে মেয়েদের বিচিত্রানুষ্ঠান হবে, সেদিন সে ফিরবে।

খবরটা শুনে ভোলানাথের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কারণ সে-ও মনে মনে বোধ হয় সতীর উপস্থিতিটা পছন্দ করছিল না। হাজার হলেও মানুষের বিবেক বলে একটা পদার্থ আছে। দূর্জ্জন লোকেরা কখনই সৎ, সাধু লোকদের সঙ্গ পছন্দ করে না। তাই সতীর মত সাধু চরিত্রের মেয়ে যদি তার দুষ্কর্মের সাক্ষ্য স্বরূপ না থাকে—তবে সে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারে।

সতী চলে গেল। সহকর্মীরা সতীর অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই তারা বল্ল--আপনি থাকলে হয়ত প্রতিবারের মত এমন পুকুর চুরি সম্ভব হত না। চোখের পর্দ্দা আছে তো।

তোমরা ভুল বলছ, সাগরিকা। ভগবান কাউকে কাউকে সৃষ্টি

করবার সময় চোখের পর্দ্দা দিতে বোধ হয় একেবারে ভুলে গিয়ে ছিলেন, তাই সতী থাকলেও এদের পুকুর চুরি সতী রুখতে পারতো না। পরন্তু তার সামনে তার ছাত্রীরা বা সহশিক্ষিকারা বঞ্চিত হচ্ছে এটা দেখে দুঃখই পেতো।

ছাত্রীরা দুঃখিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সরল মনের আবেদন সতীর মনে রেখাপাত করলেও, এদের কথা মনে করেই সতী চলে গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সতী ফিরে এলো। স্কুলে এসে দেখলো চরম বিশৃঙ্খলা। কথা ছিল মেয়েরা বিচিত্রানুষ্ঠান করবে। কিন্তু দেখা গেল, মেয়েদের অনুষ্ঠানের প্রতি ভোলানাথের দৃকপাত ছিল না।

সে নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান সূচী নাকচ করে, নিজের মন মত কিছু মস্তানকে খুসী করবার জন্য তাদের দিয়ে অতি নীচ স্তরের আমোদ প্রমোদ হাস্য কৌতুক ইত্যাদির বন্দোবস্ত করেছিল।

শুধু তাই নয়। সহকর্মীদের থেকে সতী শুনলো ছাত্রীরা বা অভ্যাগতরা প্রসাদের কণাটুকু পায়নি। এমন কি নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রতিমা দর্শন করতে এসে পূজা মণ্ডপে কাউকে দেখ্‌তে পায়নি, বা কেউ তাঁদের অভ্যর্থনা করেনি বা তাঁদের প্রতি কোন সমাদরও দেখান হয়নি।

কোন রকমে নমঃ নমঃ করে পূজা পর্ব সাঙ্গ করবার মানসে কম দামের ছোট্ট একটা প্রতিমা আনা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীর তুলনায় প্রসাদের জন্য যে ফলমূল জোগাড় হয়েছিল, তা নেহাৎই নামমাত্র।

শুধু তাই নয়। ভোগের যে ব্যবস্থা হয়েছিল তার প্রসাদও ছাত্র-ছাত্রী বা সহকর্মীদের কারও অদৃষ্টে কণামাত্র জোটেনি।

ভোগের সবই ভোগ করেছিল ভোলানাথের পরিবার ও তস্য পারিষদবর্গ। তদুপরি চোখের সামনে বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রোগ্রামের পরিণতি দেখে সতী ছাত্রীদের প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে তাদের বাড়ী চলে যেতে বললো।

কারণ হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল ভোলানাথ এই সব মস্তান-দের খুসী করবার জন্য তাদের জন্য চা, খাবারের ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু ছাত্রছাত্রী যারা সারাদিন ধরে রঙ্গ মঞ্চ সাজিয়েছে, তাদের অদৃষ্টে এক কাপ চা-ও জোটেনি, এবং এই খরচ পূজা কমিটি হতে না গিয়ে পরের দিন মিসিলেনিয়াস এর হেড্ এ পড়বে—তা সতী জানত।

ছাত্রীরা সকলেই চলে না যাওয়া পর্যন্ত সতী কর্তব্যবোধে স্কুলে বসে রইল। সতীর সামনেই পারিষদবর্গ মিঠাই মণ্ডা সহযোগে চা পানে ব্যস্ত।

ভোলানাথ জানে সতী স্কুল ফাণ্ডের টাকায় কখনও চা খায় না। তবু ভদ্রতার খাতিরে তাকে চা অফার করল। সতীও সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করল। রাত্র তখন সাড়ে এগারোটা।

ছাত্রীরা চলে যাবার পর সতীও ফিরে গেল তার কোয়ার্টারে। ক্লান্তি ও বিরক্তিতে ভরে গেল তার মন।

ভোলানাথ বুঝতে পেরেছে সতীকে আট্‌কে রাখা সঙ্গত হবে না। কারণ নানা কৌশলে ভোলানাথ সহরবাসী হতে সতীকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও—নানা সূত্রে ভোলানাথের অতীত ইতিহাস সতী অবহিত হয়েছে।

শুধু তাই নয়। পরিদর্শিকার অফিস হতেও সতী অনেক তথ্যই বোধ হয় জানতে পেরেছে। কারণ ভোলানাথের নিষেধ অমান্য করেই সতী দিন দুই পরিদর্শিকার দপ্তরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগ করেছে।

বর্তমানের পরিদর্শিকা সুচিত্রা দেবীর সতীর্থা। তিনিই সুচিত্রাকে চাকরী দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে ভোলানাথের সব অপকীর্তিই সতীর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

তাই সতীর মত আদর্শনিষ্ঠ মহিলাকে ধরে রাখতে গেলে ভোলা-নাথেরই অসুবিধা। সতী যখন মুক্তি চাইল, তার মুক্তির

দিনটি তরান্বিত করে দেবার জন্য ভোলানাথ এমারজেন্ট মিটিং ডাকলো।

এই মিটিং এ শিক্ষিকা প্রতিনিধি কেউ নেই। ভোলানাথের পেটোয়া বিত্তভোগী মুষ্টিমেয়কে দিয়েই এই মিটিং সাধারণতঃ সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং কোন রকম কারণ অনুসন্ধান না করে, বিনা বাধায় পদত্যাগ পত্র গৃহীত হল।

ভোলানাথের মত চরিত্রের লোকের রীতি তারা যখন প্রধানা শিক্ষিকাকে নিজের দলে টানতে পারে না, তখন তাকেও বিদায় দেবার আগে তার গায়ে খানিকটা কাদা ছিটিয়ে দেওয়া।

এই কারণেই সতীর উপস্থিতিতে বোর্ডের একটা চিঠির তথ্যানুসন্ধান করবার জন্য সতীর কাছে নন্দী চিঠিখানা না পাঠিয়ে স্নেহর কাছে পাঠিয়েছে।

এটা আর কিছু নয়। সতীকে প্রকারান্তে অবজ্ঞা দেখিয়ে অপমান করা। সতীও বুঝতে পারল এর উদ্দেশ্যে।

স্নেহ ছিল লাব্রেরীয়ানের পদে। সতী স্নেহকে ডেকে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক যে কয়েকটি সতীর কাছে ছিল, তা ফেরৎ দিয়ে স্কুলের কোন বই যে সতীর কাছে নেই, তার একটা রসিদ লিখিয়ে নিল।

নন্দীকে অফিস রুমে ডাকিয়ে তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল স্কুলের কোন টাকা বা খাতাপত্র সতীর কাছে নেই। যে কয়টি রেজিষ্টারী খাতা ছিল তা নন্দীকে ফেরৎ দিল।

তারপর মালিকে দিয়ে সেক্রেটারীর কাছে একটা চিঠি দিলো—আপনি দয়া করে এসে চার্জ বুঝে নিন। বিশেষ কারণে আজই আমাকে আপনার প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে হচ্ছে।

বৃদ্ধ সেক্রেটারী সতীর চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা চেপে ছুটে এলেন। বৃদ্ধ সরল, ভাললোক। সতী আসায় স্কুলের অনেক উন্নতির খবর তিনি সর্বদা শুনছিলেন চারপাশ হতে, তাই তিনি ছুটে এসেছিলেন জানতে কি কারণে সতীকে সেই দিনই যেতে হবে।

সেক্রেটারীর কাছে সতী জানালো পরিস্থিতি এমনি ঘোলাটে যে এরপর মান সম্মান বজায় রেখে এই প্রতিষ্ঠানে তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। সতীকে তো তাঁরা মুক্তি দিয়েছেনই—তবে দিনটা কয়েকটা দিন এগিয়ে দিলেন মাত্র।

সেক্রেটারী বেতনভুক্ত। তাই ভোলানাথের ও তস্য বাহন নন্দীর সব ব্যাপার অনুমোদন না করলেও, প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না। তাই সতীর অনুরোধে তিনিও একটি কাগজে চার্জ বুঝে নিয়েছেন বলে লিখে দিলেন।

সকলের সব কিছু বোঝাপড়া শেষ করে সতী সহকারী কেরানী তরুণকে বলল সে যেন সতীর সঙ্গে কোয়ার্টারে যেয়ে স্কুলের যে কয়টি আসবাবপত্র আছে, সেই আসবাবপত্র ও কোয়ার্টারের দখল বুঝে নেয়।

সতী তার নির্দিষ্ট ক্লাশে ক্লাশ নিতে যেয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের জানালো, সেদিন তার শেষ ক্লাশ নেওয়া। সহকর্মীদেরও সেই কথা জানিয়ে সে যখন তার অফিস রুমে ফিরে এসেছে, তখন আলমারীর পার্টিশানে পৃথকীকৃত অপর কক্ষে ভোলানাথের লম্ফ ঝম্ফ ও চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

যদিও মর্ণিং সেকশনে শিক্ষিকার অভাবে তার ক্লাশ নেওয়ার কথা, কিন্তু সুচিত্রার কথাই সত্য। প্রায়ই সে অনুপস্থিত থাকে। যেদিন উপস্থিত থাকে, সেদিন পারিষদ বেষ্টিত হয়ে স্কুলের পয়সায় প্রাতঃরাশ পর্বই কেবল সমাধা করে। ছাত্রীদের কোন সহায়তা তার দ্বারা হয় না।

আজও ভোলানাথ অনুপস্থিত ছিল। নন্দীই লোক পাঠিয়ে ভোলানাথকে ডেকে আনিয়েছে।

ভোলানাথ স্কুলে এসেই বৃদ্ধ সেক্রেটারীকে চার্জ বুঝে নেওয়ার অপরাধে নানাভাবে দোষারোপ করতে থাকে। নন্দীকেও এইভাবে টাকা পয়সা বা ফাইল পত্র সম্বন্ধে রসিদ দেওয়া নিয়ে গালি গালাজ

করতে থাকে। এবং উচ্চস্বরে সতীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে এইভাবে বে-আইনীভাবে সতীর কোন প্রকারেই যাওয়া হতে পারে না।

সেদিনই বিকালে এমার্জেণ্ট মিটিং ডাকা হবে—সেই মিটিং এ সতীকে তার সব অনুযোগ জানাতে হবে। এবং সেখানে তার বিচার হবে। .তৎপূর্বে কোন প্রকারেই সে যেতে পারে না।

কিন্তু ভোলানাথের লম্ফ ঝম্ফ অন্তরালেই হচ্ছিল। সতীর সামনে এসে একটি কথা বলবার সাহস ভোলানাথের ছিল না।

ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেল। সতী ভোলানাথের লেকচার শুনবার জন্য অপেক্ষা না করে, মালিকে নিয়ে সোজা ইনস্‌পেক্‌ট্রেসের অফিসে চলে গেল।

সেখানে সতী তাঁদের সব জানাল। পরিদর্শিকা বললেন—আপনি আর বিলম্ব করবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যান্। যদি আজ ওদের জে, বি র মিটিং এর প্রতীক্ষায় থাকেন, তবে ঐ মিটিং এ কেবল আপনাকে এরা লাঞ্ছিতই করবে না, হয়ত বা রাত্রে আপনার কোয়ার্টারে গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে।

ভোলানাথের অসাধ্য কিছুই নেই। অন্য কোন অপবাদে আপনাকে জড়াতে না পেরে—এই ভাবেই লাঞ্ছিত করবার ষড়যন্ত্র করেই নন্দীকে দিয়ে স্নেহের কাছে বোর্ডের চিঠি পাঠিয়েছিল।

নতুবা আপনার অনুপস্থিতিতে এতদিন সাগরিকা যখন প্রধানা শিক্ষিকার পদে অফিসিয়েটিং করেছে, তখন নন্দীর যদি কোন জিজ্ঞাস্য থাকতো আপনাকে বা সাগরিকাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কিন্তু আপনাদের দুজনকে ডিঙ্গিয়ে স্কুলের সর্বনিম্ন শিক্ষিকা স্নেহর সাহায্য চাওয়ার অর্থই তো আপনাকে অপদস্থ করা। স্নেহর কি বিদ্যা যে সে এই চিঠির অর্থ বুঝবে?

এই সবই সুপরিকল্পিত ভাবে আপনার পদত্যাগের যে কয়টা দিন বাকী ছিল, এই ভাবেই বোধ হয় প্রতিদিন আপনাকে পরোক্ষে নানাভাবে লাঞ্ছিত করবার ব্যবস্থা করেছিল।

কারণ আপনাদের কাউকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে বসিয়ে এরা পুকুর চুরি করে দোষ দেবে আপনাদের।

কিন্তু আপনারা যদি তা বুঝে ফেলেন, তবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করা হবে যে আপনারা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছেড়ে পালাবার পথ পাবেন না। এবং আপনাদের যাবার যে স্বল্প সময়টুকু তারা পাবে, তারই মধ্যে নানাভাবে নিগৃহীত করবে আপনাদের। এটাই এই স্কুলের চিরন্তন পদ্ধতি।

আপনার পূর্ববর্তিনী সবার অদৃষ্টেই নানা রকম লাঞ্ছনা ও অপবাদ জুটেছে। আপনি কৌশলে সব রসিদ হাত করে ফেলেছেন। এবার এরা বেশ বে-কায়দায় পড়ে গেছে।

তরুণকে ভোলানাথ কখনই ফার্ণিচারের রসিদ দেবার জন্য পাঠাবে না। আপনি বরং মালিকে দিয়ে একটা রসিদ লিখিয়ে নেবেন, সাক্ষী রাখবেন কাউকে ঐ রসিদে।

ভোলানাথ কোনদিন সতীর কোয়ার্টারে যেতে সাহস করেনি। তবে নানা অফিসিয়াল কাজে নন্দীকে মাঝে মাঝে পাঠাতো সতীর উপর স্পাইং করবার জন্য। অর্থাৎ কোন কোন শিক্ষিকা বা ভোলানাথের এন্টিগ্রুপের কে কে সতীর কাছে আনাগোনা করে।

পরিদর্শিকাদের পরামর্শে সতী সোজা কোয়ার্টারে গিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় দেখা গেল তার সব সহশিক্ষিকারা সতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তাদেরই সাক্ষী রেখে মালির কাছ থেকে কোয়ার্টার ও আসবাব পত্রের রসিদ সতী পেলো।

পাড়া প্রতিবেশীরাও এরই মধ্যে এসে ভিড় করল। খবরটা

ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয়নি। সবারই এক পরামর্শ, যে পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়েছে এর পর এখানে রাত্রিবাস নিরাপদ নয়।

ভোলানাথের সব চক্রব্যূহ ছিন্ন করেই সতী ফিরে চলেছে। ষ্টেশনে এসে দেখে ছাত্রীরা সব প্ল্যাটফরমে ভিড় করেছে। তাদের হাতে পুষ্প স্তবক ও মালা।

তাদের প্রতিজ্ঞা হলো অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তারা লড়বে এবং যার জন্য প্রত্যেক প্রধানা শিক্ষিকাকে তারা হারাচ্ছে, তাকেই উচ্ছেদ করে দেবে এই স্কুল হতে। তারপর সতী যেন আবার ফিরে আসে।

করুণ হাসি ফুটে উঠল সতীর মুখে। সে জানত এই দুর্ধর্ষ লোকের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা এই বালিকাদের নেই। এই সব কিশলয়দের উচ্চ আদর্শের ছাঁচে ঢেলে সাজাবার অভিপ্রায় নিয়েই সতী এসেছিল।

কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কীট প্রবেশ করেছে, তারাই এই সব সুন্দর প্রতিষ্ঠানগুলি দংশন করে ঝাঁজরা করে দিচ্ছে। এইগুলি কখনই আর সুন্দরভাবে ফুটবার সম্ভাবনা নেই।

এক এক করে সবার থেকে বিদায় নিয়ে সতী তার নির্দিষ্ট ট্রেনে উঠল। সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বাঁচল।

কিন্তু প্রবঞ্চনা ও ব্যর্থতার হতাশায় মনটা তার ভরে গেল। স্বল্প কয়দিনের অভিজ্ঞতার যে মালা সে এই প্রতিষ্ঠান হতে পেয়েছে তারই জপ করছিল মনে মনে।

পণ্ডিত মশায়ের চরিত্রটি ভারী সুন্দর। যেমনি তার শুচি শুভ্র চেহারা, তেমনি তার চরিত্র। প্রবীণ পণ্ডিতমশায়ের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ভোলানাথ তার উপরও জুলুম কম চালাননি। ভোলানাথের অনেক অপকর্মের নীরব সাক্ষী এই পণ্ডিতমশায় এবং এই প্রকাণ্ড শিক্ষায়তনটি। পণ্ডিতমশায় প্রায়ই এসে সতীকে তার

কোয়ার্টারে শুনিয়ে যেতেন সেই সব অপকীর্তি এবং সাবধান করে যেতেন।

এঁদের আদর্শ, অধ্যবসায়, একাগ্রতা সবই নিগৃহীত হচ্ছে এই কয়টি মুষ্টিমেয় দুর্বৃত্তের হাতে। এরা সুন্দর কিছু গড়তে জানে না। পরন্তু অপরে কিছু সুন্দর গড়ছে দেখলে কাল পাহাড়ের মত তা ভেঙ্গে চুরমার করার প্রবৃত্তি এই সব লোকের জন্মগত।

৭

শিলং এর রাণী ভবানী বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে ডাক এলো সতীর। এই অঞ্চলে সতীর প্রাক্তন কয়েকজন সহকর্মী স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যাপক।

সতী তাঁদেরই একজনের থেকে ঐ স্কুলের ফার্ষ্ট হ্যাণ্ড ইন্‌ফরমেশন সংগ্রহ করে জানলো প্রাক্তন প্রধানা শিক্ষিকার সঙ্গে সেক্রেটারীর বনিবনা না হওয়ায় প্রধানা পদত্যাগ করেছে।

সতী নিজের খুসী ও আদর্শানুযায়ী এই স্কুল সাজিয়ে নিতে পারবে। কাজ্ করবার বেশ প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে। কোন কিছুরই অভাব নেই। তাছাড়া প্রাক্তন সহকর্মীরা যখন একই সহরে বসবাস করেন, তখন সতীর পক্ষে খুবই নিরাপদ জায়গা এইটা।

সেক্রেটারীও পত্রোত্তরে জানাল—আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম এই স্কুলের জন্য যে রকম প্রধানা শিক্ষিকার আমরা অনুসন্ধান করছিলাম, আপনি অনুরূপ আদর্শের। আপনার যাতে এখানে কোন রকম অসুবিধা না হয়, আমি সর্বতোভাবে সে দিকে দৃষ্টি রাখবো।

উড়ো জাহাজে সতী আবার পাড়ি দিল ভিন্ দেশে। ট্রেনের পথে অনেকবার উঠা নাবার ঝামেলা হতে অব্যাহতি পাবার জন্যই উড়ে চললো।

প্রতি প্রতিষ্ঠানই স্বাগত জানায় অতি সমারোহ করে। কিন্তু পদার্পণ করবার কয়েক ঘন্টা পরেই ক্লেদাক্ত পরিবেশের পর্দা ক্রমশঃ উঠতে থাকে। পরিশেষে বীভৎস দৃশ্য দেখে—ত্রাহি মাম্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ বলে ডাকতে হয়।

না জানি এই নতুন কর্মস্থলে পা দিয়ে আবার কি অভিনব চিত্র

চোখে পড়বে। সহকর্মীর চিঠি পড়ে পরিবেশটা যে খুব একটা সুখের ও শান্তির হবে তা মনে হচ্ছিল না।

সারা পথ সতী কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে দেখছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেই পবিত্রতা, সেই আদর্শ আর কোথাও নেই। তাই তার মন প্রাণ মুষড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা প্রতিষ্ঠানের কলুষ দেখে। আগের সেই উৎসাহ, উদ্যম সব যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

যে নবীন সবুজ উৎসাহ নিয়ে সে একদিন প্রথম কর্ম জীবনে পা দিয়েছিল, আজ তা নিস্তেজ, নিষ্প্রভ। মরচে ধরা মনকে নতুন উৎসাহ উদ্যমে ইলোক্‌ট্রোপ্লেট করে নেওয়া যেন কোন্ প্রকারেই সম্ভব হচ্ছে না।

আশাবাদী সতীর মনে নৈরাশ্যের নিরেট কোটিন পড়ে গেছে। কোন রকমেই ঘসে মেজেও সেই কোটিন যেন আর তোলা যাচ্ছে না। বার বার ঘা খেয়ে খেয়ে সতীর উৎসাহের সব দম যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু সে চলেছে।

নীল আকাশের কোলে পেঁজা সাদা তুলোর মত শুভ্র মেঘের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বিমানখানি যখন হেলে দুলে চলেছে, সতীর মনেও দোলা দিচ্ছে নতুন কিছু গড়বার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু নীল আকাশের মত এমন শুচি শুভ্র পরিবেশ যে সে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। পর্দার চাকচিক্য দেখে সতী বার বার ছুটে গিয়ে দেখেছে পর্দার অন্তরালের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। সেই নোংরা পরিষ্কার করে তা শুচি শুভ্র করে তোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তা করতে গেলে সতীর মন প্রাণ অশুচি হবে মাত্র। তবু সতী বার বার মনকে শুভ চিন্তায় মগ্ন রাখতে চাচ্ছে।

বিমান এসে বিমান ঘাটিতে পা ফেললে। পাহাড় ঘেরা সুন্দর ছিম্‌ছাম্ পাহাড়ী শহর। সতী যেন প্রকৃতি দেবীর একেবারে মুখোমুখী হয়েছে। সে মুগ্ধ হোল। কিন্তু প্রকৃতির কোলে

মানুষ নামে যে জীব আছে—তাদের ক্রুর চরিত্র সর্বদাই সতীকে ছোবল দিতে চায়।

প্রকৃতি তার সুন্দর রূপ নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে বারে বারে। তার স্নিগ্ধ, নির্মল, পবিত্র পরিবেশ সতীর মনে অভয় বাণী পৌঁছে দিয়েছে। দুই করপুটে প্রকৃতি যেন শান্তির শীতল বাতাসে সতীর মনে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু মানুষের সংস্পর্শে যখনই সতী আসছে, দেখছে তার ভয়াবহ রূপ। তার ক্রুরতা, তার শঠতা, তার রুক্ষতা, তার কৃতঘ্নতা —সমগ্র সৃষ্টিকে বিষাক্ত করে দিয়েছে। মানুষের বহুরূপী রূপটা সতী পছন্দ করে না।

এই বহুরূপী রূপের মধ্যে কোনটা যে মানুষের আসল খোলস এবং কোন রূপটাকে যে বিশ্বাস করা সঙ্গত সতী তা আজও বুঝে উঠতে পারছে না। প্রতিবারই যাকে সত্য ও ঠিক মনে করেছে— প্রতিবারই সে তাকে প্রবঞ্চিত করেছে। তার বিচারের ত্রুটি তাকে মান্‌তে হয়েছে।

যাক্ নতুন কর্মস্থলে সতীকে 'রিসিভ' করতে এসেছিল বিমান ঘাটিতে ঐ স্কুলের চাণক্য পণ্ডিত। চাণক্য পণ্ডিতদের যুগ এখনও শেষ হয়নি। অবশ্য বেশে বাসে তাকে দেখে ব্রাহ্মণ বলেই মনে হয় না—পণ্ডিত ত দূরের কথা। এরা হল নব্য যুগের ব্রাহ্মণ। চেহারায় বা স্বভাবে ব্রাহ্মণত্ব কিছুই নেই। এদের ব্রাহ্মণত্ব নিদর্শন কারও বা পৈতায়, কারও বা শুধু পদবীর মধ্যে।

পথে যেতে যেতে জগাই চরণ শোনালো তাদের স্কুলের ইতিকথা। শুধু ইতিকথা শুনিয়েই সে ক্ষান্ত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধির শাণে ধার দিয়ে সতীর প্রাক্তন সহকর্মীদের নামোল্লেখ করে সতীকে সতর্ক করে দিয়ে বলল যে—তাঁরা সুরুতেই জগাই চরণের মাধ্যমে সাবধানী বাণী পাঠিয়েছেন যে সতী যেন স্থানীয় স্কুল সংক্রান্ত রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ে।

জগাই চরণ আস্তে আস্তে নামাবলী ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে স্কুলের ইতিবৃত্ত খুলে ধরলো সতীর সামনে।

পাহাড়ী দেশ শিলং। বিমান ঘাটি হতে প্রথমে বিমান ঘাটির বাস, পরে পাব্লিক ট্যাক্সি করে পাহাড়ী আঁকা বাঁকা সর্পিল পথ বেয়ে আমরা গৌহাটি হতে শিলং এর পথে চলেছি। প্রকৃতির অপূর্ব রম্য ভূমি। সতীর মন প্রকৃতির এই সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু জগাই পণ্ডিতের ঝোলা হতে আস্তে আস্তে স্কুল সম্বন্ধে যে তথ্য বেরিয়ে আসতে লাগলো, এ যেন বেদেনীর ঝোলা হতে রকমারী বিষাক্ত সাপ।

সতী যেন নীরব দ্রষ্টার মত দক্ষ বেদেনীর সাপের খেলায় মোহিত হয়েছে। বাহ্যিক আর কোন দিকেই তার দৃষ্টি নেই, মন নেই।

জগাই জানালেন এই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্কুল সেক্রেটারী ৭টা মামলা করেছে। তার কোন কোনটা হাইকোর্টেও ঝুলছে। এবং সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে প্রাক্তন প্রধানা শিক্ষিকা ১০টা মোকদ্দমা করেছেন। সিভিল ও ক্রিমিন্যাল দুই রকমেরই।

সাপের লড়াই এর মত উভয় উভয়কে সমানভাবে ছোব্‌ল দিয়ে চলেছে। যদিও প্রাক্তন প্রধানার চাকরী নাকচ করতেও সেক্রেটারীকে অনেক নাজেহাল হতে হচ্ছে।

এখনও তার বিরুদ্ধে অম্বালিকা বড়ুয়ার মামলা ঝুলছে। এই কারণে অম্বালিকা চাকরী হতে পদচ্যুত হয়েও স্কুল কোয়ার্টারে স্বামী পুত্র নিয়ে পরমানন্দে বিরাজ করছেন। তার দোর্দণ্ড প্রতাপে তারই কোয়ার্টারের সংলগ্ন টিচারর্স কোয়ার্টারে অন্য কোন টীচার বসবাস করতে পারে না।

অম্বালিকার বিরুদ্ধে জগাই পণ্ডিতের ঝোলা হতে যে সব রম্য কাহিনী বের হল, সতীর শিক্ষিত মন তার সেণ্ট পার্সেণ্ট সত্য বলে গ্রহণ করতে পারলো না।

অম্বালিকা নাকি কয়েকবার এম, এ পরীক্ষায় বসেও পাশ করতে

পারেনি। তারপর স্কুলের দুষ্টু ছাত্রছাত্রীদের মত এই বয়সে পরীক্ষার হলে নকল করতে সুরু করে। ধরা পড়ায় তার নামের পাশে আর এ চিহ্ন চিরকালের জন্য লেখা হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার এই পরিণতি। বিশেষ করে মহিলা পরীক্ষার্থিনী। তদুপরি একটি স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা। সুতরাং যে স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার এই কীর্তি,—সেই স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের কি যে পরিণতি হতে পারে, তারই সম্ভাবনায় নাকি বিশ্ববিদ্যালয় অম্বালিকার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবে মনস্থ করেছিল।

কিন্তু অম্বালিকা ঐ ডিপাটমেণ্টের কর্তা ও অন্যান্যদের কাছে নাকি ধরনা দিয়ে পড়ে। তার প্রতি কোন রকম শাস্তির ব্যবস্থা হলে এতগুলি সন্তানের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হবে। বেকার স্বামী। স্কুলে সেক্রেটারীর সঙ্গে চলেছে তার অগুনতি মামলা মোকদ্দমা।

সুতরাং অন্যত্র চাকরীর আর সম্ভাবনা থাকবে না। জননীর আর্ত আবেদন যুগে যুগে যেমন সন্মান পেয়েছে, এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে নাকি অম্বালিকা সব অপরাধ হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে বার বার।

তাছাড়া তহবিল তছরূপ, হিসাব পত্রের খাতা উধাও করা, স্কুল লাইব্রেরীর বই চুরি—এক কথায় যত রকম অভিযোগ একজন মহিলার বিরুদ্ধে করা সম্ভব তার কোনটাই বাদ পড়েনি।

শুধু তাই নয়। অম্বালিকা একা নয়। তার স্বামীটিকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং সর্বতোভাবে ষোল কলা পূর্ণ করবার যথাযথ ব্যবস্থা হয়েছিল।

অম্বালিকা বড়ুয়াও তেমনি সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপ ইত্যাদি বহু রকমারি জাল বিছিয়েছে আইনের আদালতে।

যতই জগাই পণ্ডিত ইলাকৃষ্টিকের মত তার অভিজ্ঞতার ঝোলা

হতে স্কুলের ইতিবৃত্ত টেনে টেনে বের করছিল, ততই সতী অবাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে শুনছিল।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে যত রকম দোষ ভাবতে পারা যায়, তার কোনটারই অভাব এই প্রতিষ্ঠানে নেই।

এমন পরিবেশের মধ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে স্বভাবতঃই সতীর মন ভয়ে মুষড়ে পড়ল।

কেবল অম্বালিকা নয়। স্কুলের সেক্রেটারীর সম্বন্ধে যে সব বিচিত্র কাহিনী শুনলো, সে সবও শ্রুতি মধুর নয়। সহরে কলেজ আছে, শিক্ষিত বহু লোক আছে।

তবু এমন একজনকে স্কুলের সেক্রেটারী করা হয়েছে শিক্ষা, কৃষ্টি সব কিছুতেই সে সহরে অন্যদের তুলনায় নগণ্য।

এসব কীর্তি কাহিনী জানা সত্ত্বেও কেন যে অভয়বাবুকে রাণী ভবানী স্কুলের সেক্রেটারী করা হল তা খুবই দুর্বোধ্য। জগাই পণ্ডিত বলেছিল এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা সদাই বিব্রত আপনাকে লয়ে।

তাই এসব ব্যাপারে তারা আর এগিয়ে আসে না। ফলে অভয়বাবুর মত লোকের অভয়বাণীতে সদা সন্ত্রাস জড়িত বক্ষে অভিভাবকদের মেয়েদের স্কুলে পাঠতে হয়।

অবশ্য উঁচু ক্লাশের কিছু কিছু দুর্মুখ ছাত্রী অভয়বাবুর শিষ্টাচারের প্রত্যুত্তর দিয়েছে ভাল ভাবেই—যাতে অভয়বাবু মাথা উঁচু করে দ্বিতীয় দিন আর তাদের সামনে যেতে পারে নাই।

কথায় বলে—স্বভাব যায় না ম'লে। তাই ছোট ছোট ছাত্রীদের থেকে শিক্ষা পেয়েও তার শিক্ষা হয়নি। ভদ্রলোককে স্কুল কর্তৃপক্ষ চোখের মাথা খেয়ে সামনাসামনি কিছু বলতে পারে না। কিন্তু এর দৃষ্টি কটু-আচরণও সহ্য করতে মন চায় না।

যিনি সেক্রেটারীর রাশ টেনে ধরতে পারতেন, তিনি নিজেই যে

বল্গাহীন উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছেন। যার বিশৃঙ্খল কাজ কর্মের জন্য স্কুলের দরজা প্রায় বন্ধ হবার মত হয়েছে।

এমন প্রতিষ্ঠানের গুরু দায়িত্ব সতী কি করে বহন করবে? সমস্ত মন জুড়ে তার এই কথাটি যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তার প্রাক্তন সহকর্মীরাই বা তার কাছে এসব কথা গোপন করে—কেন তাকে ডেকেছে এমন স্কুলের দায়িত্ব নিতে?

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার মন হারিয়ে ফেলেছে সতী। তার মন চাপা পড়ে গেছে রাণী ভবানী স্কুলের ঘটনা বহুল কাহিনীর আড়ালে।

আঁকা বাঁকা পথ পরিক্রমা করে সাপের মত পাহাড়ের কোল জড়িয়ে জড়িয়ে ছুটে চলেছে যানবাহন। কিন্তু সতীর মনে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠ্‌ছে অনাগত ভয়ের একটা কালো ছায়া।

ঘাটে ঘাটে সে পথের সন্ধানে কেবল হোঁচট খেয়েই চলেছে। তৃষ্ণার ব্যাকুলতা নিয়ে চলেছে যেন মরীচিকার দিকে।

সতীকে নিয়ে জগাই পণ্ডিত সেক্রেটারী অভয় চালিহার বাড়ী এসে পৌঁছলো। সতী প্রথমেই আপত্তি তুলেছিল। সোজা সে তার জন্য নির্দিষ্ট কোয়ার্টারে উঠতে চেয়েছিল।

জগাই পণ্ডিত জানালো কোয়ার্টার নিয়ে কি সব গোলমাল আছে, তাই অভয়বাবু প্রথমে আপনাকে তাঁর ওখানেই উঠাতে বলেছেন। জগাই পণ্ডিতের উত্তর শুনে সতীর শরীরের রক্ত যেন ইলেকট্রিক কারেণ্টের মত দ্রুত গতিতে মাথায় গিয়ে উঠলো।

কিন্তু সে-ও নিমেষের মধ্যে সমস্ত ক্রোধকে সংযত করে নিলো। কারণ তার মনের আরশি সে সবার সামনে তুলে ধরতে এখনি রাজী নয়। তার মনে পড়ল প্রবাদটা—পড়েছি যখন যবনের হাতে খেতে হবে এক সাথে।

তাই মুখে হাসি টেনে জানালো অভয় চালিহা সতীর কোয়ার্টার সর্বতোভাবে রেডি আছে—একথাই তাকে জানিয়েছিলেন।

জগাই পণ্ডিত জানাল এই স্কুলের ইতিহাস লোকের মুখে মুখে ডালপালা ছড়িয়ে এত দূর এগিয়ে গেছে যে কোনও প্রধানা শিক্ষিকাই পাওয়া যায় না।

আপনাকে এই স্কুলে আনতে আপনার সহকর্মীদের মারফৎ ভাল সার্টিফিকেট পাঠাবার জন্য সেক্রেটারীকে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে।

সতী বুঝলো নৌকো কেবল ফুটো নয়, হাওয়াও তার প্রতিকূল। তাই বেশীদূর তাকে এগোতে হবে না।

প্রথম দর্শনেই সতীর মনের দর্পণে অভয় চাহিলার যে ছাপ পড়লো, তা খুব শুভ নয়। কথাবার্তায় শকুনীর সমগোত্রীয় মনে হল।

প্রাথমিক আলাপের পরই সতী বলল—আমার কোয়ার্টারে যাওয়াই ভাল। রাত হয়ে গেলে অসুবিধা হবে নতুন পরিবেশে।

অভয় চালিহা কাষ্ঠ হাসি হেসে উত্তর দিল—কোয়ার্টার আপনার আছে বটে, কিন্তু ওটা খুব সুখকর বাসস্থান হবে না। পরন্তু তাকে ভীষ্মের শরশয্যার সঙ্গে তুলনা করতে পারেন।

পাশেই রয়েছে অম্বালিকা। তার শূন্য স্থান সে অন্য কাউকে দিয়ে পূর্ণ করাতে চায় না। তাই ওখানে বাস করা মানে আপনাকে জীবন হাতে নিয়ে বাস করা। বিদেশে এসে এমন স্থানে বাস করা নিশ্চয়ই আপনার অভিপ্রেত নয়।

—তবে কোয়ার্টারের কি ব্যবস্থা হবে ?

চিবিয়ে চিবিয়ে হেসে অভয় চালিহা উত্তর দিল—আমার এখানে প্রথম দিন সাতেক থাকুন তো। তারপর এখানে আপনার পছন্দ না হয় অন্য কোথাও ব্যবস্থা করা হবে। আমার বাসায় নিজের বাড়ীর মতই থাকবেন। এমনি থাকতে না চান পেয়িং গেষ্ট হয়ে থাকতে পারেন।

আষাঢ়ের ঘন কৃষ্ণ মেঘ আকাশ ছেড়ে যেন সতীর মুখ জুড়ে

বসেছে। রাশ ভারী গলায় সে উত্তর দিল—এমন কোন সম্ভাবনা তো আপনারা আমাকে জানাননি।

এস, ডি, ও আপনাদের স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। চলুন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে ফয়সলা করে আসি। অন্য কোন অলটারনেটিভ্ কোয়ার্টার যদি আপনারা খুঁজে না পান্, তবে কালকের প্লেনেই আমি ফিরে যাবো। রিটার্ণ টিকিটে এসেছি। সুতরাং বুকিং এ অসুবিধা কিছু হবে না।

আমার প্রাক্তন সহকর্মীরাই বা আমার সম্বন্ধে এ ধরণের প্রস্তাবে রাজী হলেন কি করে জানি না। তাঁরা তো জানেন আমি এ ধরণের কোন রকম প্রস্তাব কখনই অনুমোদন করতে পারব না।

অভয়বাবু ভেবেছিলেন সতীর নবীন বয়স। এখনও বয়সের চাপে চামড়া কুঁচ্‌কে যায়নি। সুতরাং একে নিয়ে একটু ছেলে খেলা চলবে হয়ত। অন্ততঃ পরখ করে দেখতে দোষ কি ?

কিন্তু দেখলেন এ একেবারে জাত কেউটে। তা বাচ্চাই হোক্ বা বড়ই হোক্—দুই ই সমান।

এস, ডি, ওর সঙ্গে দেখা হল না সতীদের। তিনি সরকারী কাজে স্থানান্তরে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ পরিচয় হল। চা পানে আপ্যায়িত করলেন তিনি নতুন প্রধানা শিক্ষিকাকে।

আবার তারা ফিরে এল অভয় চালিহার বাসায়। জগাই পণ্ডিত জানালো সতীর একজন প্রাক্তন সহকর্মী তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলে খবর পাঠিয়েছেন। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিমলবাবু এসে উপস্থিত হলেন।

অভয়ের একটি ঘরে সতীর সব জিনিষপত্র ছড়ানো। এভাবে এই বাড়ীতে মুহূর্ত খানেক থাকতে সতীর মন চাইছিল না। ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় সতী যেন অতিষ্ঠ।

বিমলবাবুকে দেখে সতী যেন অকূলে কূল পেল। সে প্রশ্ন

করল—এখানের পুরো ইতিহাস আমাকে না জানিয়ে আপনারা আমাকে এই সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিলেন কেন ? শুধু তাই নয়। থাকবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাও অভিনব। এপ্রস্তাব যে আমি সমর্থন করবো না—তা তো জানেন।

বিমলবাবু চারিদিকে তাকিয়ে দেখল ঘরে অভয় নেই। অভয়ের কান বাঁচিয়ে বিমলবাবু উত্তর দিলেন—স্কুলটাকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে এত দূরে টেনে এনেছি। দুজনে মিলে স্কুলের বারটা প্রায় বাজিয়ে দিয়েছে।

অভয়বাবু লোকটি কেমন ?

চারিদিকে তাকিয়ে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলেন অভয়বাবুর মেয়ে ও ছেলেরা চারপাশে ঘোরাফেরা করছে। তিনি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে একজনকে তার সাইকেলটা ঠিক আছে কিনা দেখে আসতে বল্লেন। আর এক জনকে অভয়বাবুকে ডেকে দিতে বল্লেন। উভয়কে সরিয়ে দিয়ে বিমলবাবু ফিস্‌ফিস করে বললেন—

এখানে তো তার বিরুদ্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমাদের তারাপ্রসন্নর বাড়ী অভয়বাবুর বাড়ীর কাছেই। চলুন, ওখানে যাই। তারাপ্রসন্নবাবু বলেছেন আপনি এসে থাকলে আপনাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যেতে।

তারাপ্রসন্নবাবুর বাড়ী যদি কাছেই হয়ে থাকে, তবে উনি কেন এলেন না ?

ওঁনার শরীর ভাল নয়। তাই উনি আপনাকে নিয়ে যেতে বল্লেন। এবং রাত্রে ওঁনার ওখানেই আপনার আমার নেমন্তন্ন খবরটা অভয়বাবুকে জানিয়ে যেতে বল্লেন।

সতী কোন উত্তর দেবার আগেই কৃষ্ণকায় অতিকায় চেহারার অভয়বাবু পান চিবোতে চিবোতে এসে বললেন—আপনাদের বন্ধু তো এসেছেন। তবে তাঁর কোয়ার্টার ঠিক না হওয়ায় চলে যেতে

চাইছেন। আমি বলেছিলাম আমার বাসায় থাকবার জন্য, তাতে উনি রাজী নন।

—কোয়ার্টার ঠিক না করেই ওঁনাকে এভাবে ব্লাফ দিয়ে এখানে আনানো আপনাদের মোটেই উচিত হয়নি।

আপনার বাসায় না থাকতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। যাক্ প্রসন্নবাবুর বাড়ীতে রাত্রে আমাদের নেমন্তন্ন, ওঁনারও নেমন্তন্ন, সুতরাং ওঁনাকে নিয়ে যাচ্ছি। দেখি ওঁনার থাকার ব্যবস্থা কিছু করতে পারি কিনা।

—সে কি রাত্রে উনি এখানে খাবেন বলে আমি তাঁর খাবার বিশেষ ব্যবস্থা করছি। আমার এখানে না খেয়ে আপনাদের ওখানে খাবেন এটা কি রকম হল? অন্ততঃ আজ রাতটা উনি আমার এখানে খান্।

প্রথম দৃষ্টিতেই এই লোকটিকে দেখে এবং তার কথা ও কথা বলার ভঙ্গী দেখে সতীর মনে ঘৃণা জন্মেছিল। তারপর তার সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনে সতীর মন আরও বিষিয়ে গিয়েছিল। উত্তরে তাই সে বলল—কোনও সেক্রেটারীর বাড়ীতে খাওয়া আমার প্রিন্‌সিপ্যালের এগেন্‌ইষ্টে। সুতরাং আমি আমার নীতি বিরুদ্ধ কোন কাজ করতে রাজী নই। আমি অত্যন্ত দুঃখিত এজন্য। আমাকে যদি আগেই জানাতেন তবে আমি আপনাকে এতটা কষ্ট করতে বারণ করতাম।

অভয়বাবুর মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে রাগে উঁনি বেলুনের মত ফুলে রয়েছেন। সুযোগ পেলেই ফেটে পড়বেন। হয়ত অতি কষ্টে তিনি নিজের ক্রোধ সংযত করবার বৃথা চেষ্টা করলেন, যার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছিল তার দুই রক্ত জবা চোখ দিয়ে।

বিদ্রূপের হাসি হেসে তাই তিনি বল্লেন—আমি গরীব একজন কেরাণী। আমার বাসায় কি আপনাদের খাওয়া শোভা পায়?

সহরের বড় বড় অধ্যাপকদের বাড়ীতে খেতে পারেন—বিশেষ করে তাঁরা আপনার পুরানো বন্ধুলোক।

তবে স্কুলের সেক্রেটারী হিসাবে ভদ্রতা স্বরূপ আমার করণীয় যা তা করবার চেষ্টা করছিলাম।

অভয়ের কথা বলার ভঙ্গী এতই কুৎসিত যে সতী ও বিমলবাবুর মার্জিত রুচিতে তার কথার প্রতিবাদ করতে ঘৃণা হল।

তারা উভয়ে প্রসন্নবাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হল। পথে বিমলবাবু বলল—এই লোকটির গুণ সবই আছে—পৈত্রিক কিছু সম্পত্তি ছিল—সবই এই কারণে গুড়িয়ে দিয়েছে। এক কথায় একে গুণনিধি বলা যায়।

—এমন লোককে আপনারা মহিলা প্রতিষ্ঠানের সব দায়িত্ব দিয়েছেন কোন্ সাহসে ? আপনাদের মেয়েদের ও তাদের শিক্ষিকাদের দায় দায়িত্বও তো এরই উপর নির্ভর করছে।

—কথাটা সত্য। পরন্তু এই সহরে উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক থাকা সত্ত্বেও কেউ-ই এই স্কুলের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়াতে রাজী নয়।

কারণ কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এই স্কুলে অনেক জট পড়েছে। সেই জট ছাড়ানো সোজা নয়। পরন্তু এই জট যারা ছাড়াতে যাবে— তারাই জড়িয়ে পড়বে এই জটে।

ভদ্রলোক ও শিক্ষিত লোকেরা পারতপক্ষে কোন নোংরামীর মধ্যে যেতে চায় না। এই কারণেই অল্প শিক্ষিত এমন চরিত্রের লোককে এই স্কুলের সেক্রেটারী করা হয়েছে।

—জগাই পণ্ডিত লোকটি কেমন ?

—আপনাকে তারা প্রসন্নর বাড়ীতে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যই আপনাকে এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত সব কীর্তিমান পুরুষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়ে দেওয়া—যাতে আপনি কারো বিছানো কোন জালেই জড়িয়ে পড়তে না পারেন।

—জগাই পণ্ডিত তো আপনাদের নাম করে সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে

অনেক কথা বলে আমাকে সাবধান করে দিল। অবশ্য তাকে দেখে চাণক্য পণ্ডিতের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে মনে হল।

—আপনার অনুমান সত্য। এর ভাই মাধাই আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। তিনিও এই স্কুলে চাকরী করেন। মাধাই এর ধারণা তার মত ইংলিশ কেউ জানে না। অথচ ইংলিশেই বার বার ফেল করার জন্য ডিগ্রী লাভ তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই জগাই মাধাই দুই ভাই-ই স্কুলের উপর খুব খবরদারী করে বেড়াচ্ছে—যদিও শিক্ষায় দীক্ষায় সবার নীচে এরা। বয়সে অবশ্য একজনের বাণপ্রস্থে যাবার সময় হয়ে গেছে, আর একজনের স্কুলে থাকার আয়ুও আর হয়ত ২।১ বছর বাকী আছে।

বয়সের এদের নেই গাছ পাথর। এই দুই জনই কেবল আপনার স্কুলের আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক। আর একজন প্রবীণ ভদ্রলোক হচ্ছেন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট।

অম্বালিকার সঙ্গে এই দুই ভাই এর ছিল হরিহর আত্মা। তখন এই ভ্রাতৃদ্বয় যেন রক্ষা কবচের মত অম্বালিকার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট প্রহর থাকত।

জগাই পণ্ডিত সহরের সব ঘাঁটি হতে খবর সংগ্রহ করে দিত। আর মাধাই মাষ্টার তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির শাণে ধার দিয়ে অম্বালিকার প্রতিকূল আবহাওয়াকে অনুকূলে ফেরাবার নানা কৌশল শিখিয়ে দিত।

এই ভাবেই চলেছিল তাদের যুগ্ম অভিযান। তারপর হঠাৎ তাদের মধ্যে কি যে ঘটলো সঠিক জানি না, কিন্তু তাদের মধ্যে দেখা গেল বৈরী ভাব। যেন অহি নকুল সম্পর্ক।

অম্বালিকা বলে এরা অনেক টাকা অগ্রিম নিয়েছে। স্কুলের টাকা হিসাব মিলাবার জন্য ফেরৎ চাইতে যেয়েই ঘটেছে বিভ্রাট।

তাদের সততার উপর বিশ্বাস করে লিখিত কোন রসিদ নাকি অম্বালিকা নেয়নি। তার এই নিবুর্দ্ধিতার সুযোগ নিতে নাকি চাণক্য পণ্ডিতদ্বয় বিন্দু মাত্র বিলম্ব করেনি।

দেখা গেল রঙ্গমঞ্চে যে অসি তারা অভয়ের বিরুদ্ধে শাণাচ্ছিল, তা উচিয়ে ধরল অম্বালিকার মাথার উপরে। অভয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেন মার্জ করল। অম্বালিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার ধ্বনি শোনা গেল।

অভয় দলে ভারী হয়ে গেল। অম্বালিকার অভয়ের বিরুদ্ধে যা কিছু গোপনীয় ষ্টেপ নিচ্ছিল, সবই ফাঁস হয়ে গেল অভয়ের কাছে।

ফলে অম্বালিকা তার মামলায় কিছুটা কাবু হয়ে পড়েছে। তবে সে-ও তেমন ভীরু মেয়ে নয়। তাই সেও পরাজয় স্বীকার না করে মামলা লড়ে চলেছে। দুই পক্ষই সমান শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী।

দূর্জন লোকেরা বলে অম্বালিকার বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের যে মামলা সাজানো হয়েছে তা এই যুগ্ম চাণক্যের পরামর্শেই।

—এরা তো দেখছি মীরজাফরের উত্তর পুরুষ।

বিমলবাবু সহাস্যে উত্তর দিল—তা যা বলেছেন বটে। এখানে সবাইকেই মীরজাফরের সমগোত্র মনে করে কাজে এগোতে হবে।

তারাপ্রসন্নের বাড়ী যাবার আগেই সতী অভয়কে জানিয়েছিল রাতটা সে স্কুলেই কাটাবে। পরদিন ভোরে এস, ডি, ওর সঙ্গে দেখা করে অন্য ব্যবস্থা করা হবে। কারো বাড়ীতে সে থাকবে না।

স্কুলের দালান মস্ত। তারই এক পাশে একটা রুমে সতী যথাসম্ভব প্রাইভেসি রক্ষা করে থাকবার ব্যবস্থা করল। যদিও অভয় চালিহা তাকে জানিয়ে ছিল তার জন্য ফার্নিস্‌ড্ কোয়ার্টার রয়েছে। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা গেল কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

যাক্ এস, ডি, ও ভদ্রলোকও ভাল মানুষ। তাঁর সহযোগীতার প্রতিশ্রুতিতে সতী চাকরীতে জয়েন করল।

কিন্তু চাকরীতে জয়েন করার পর সতী দেখল তার অবস্থা ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের মত। স্কুল আছে, কিন্তু অফিসে নেই কোন কেরাণী বা খাতাপত্র, হিসাব পত্র।

এমন কি গুটি কয়েক বই এর আলমারী যে আছে, তাও বেওয়া-

রিশের মত পড়ে রয়েছে। বই গুলি তেমনভাবে সাজানো নেই। এমন কি আলমারীগুলিতে একটা তালাও নেই। যে ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে আলমারী খুলে বই নিচ্ছে। বই ইস্যুর কোন খাতাপত্রও নেই।

তেমনি অফিসের অন্যান্য আলমারীগুলি অবহেলিতভাবে খোলা পড়ে রয়েছে। তার মধ্যে কারেণ্ট মাইনার কালেকশন্ বই-গুলি রয়েছে। ক্লাস রেজিষ্টার রয়েছে, টীচারদের এটেনডেনশ্ বুক রয়েছে। কিন্তু সেগুলিও বেওয়ারিশ মালের মত যত্র তত্র পড়ে আছে।

মেয়েদের কালেকশন্ বুক টীচারদের এটেন্ডেনশ্ খাতাগুলি একেবারে নতুন আমদানী। তাই নতুন বাঁধানো খাতার সোঁদা গন্ধ যেন এখনও খাতাগুলির পৃষ্ঠা হতে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রধানা শিক্ষিকার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেরাজের কোন চাবি নেই। সতী শুনেছে স্কুলের নিজস্ব একটা টাইপ মেশিন আছে, কিন্তু সেটা সেক্রেটারীর বাড়ীতে। ছাত্রীদের ভূগোল ও বিজ্ঞানের এ্যাপারেটাস্—সবই খোলা পড়ে রয়েছে।

স্কুলে কোন নিয়ম শৃঙ্খলার বালাই নেই। টীচাররা খুসী মত স্কুলে আনাগোনা করছে। যার যে পিরিয়ড হতে ক্লাশ সুরু, সেই সময়ে সে স্কুলে আসছে।

এ যেন স্কুল নয় কলেজ। সব যেন বাঁধন ছাড়া। স্বাধীন ছাত্রীরাও খুসী মত বেরিয়ে যাচ্ছে কয়েক পিরিয়ড ক্লাশ করে।

এ যেন কলেজ। কারো কোন অনুমতির পরোয়া কেউ করে না। চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা। জগাই মাধাই বিশেষ করে দেরীতে স্কুলে এসে থাকে।

প্রথমেই সতীকে শক্ত হাতে স্কুলের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হ'ল। ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষিকার সংখ্যা কম। অথচ স্থানীয়

শিক্ষিকা প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও সেক্রেটারী ন্যায্য বেতন দিয়ে তাদের নিয়োগ করবে না।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সেক্রেটারী অনেক প্রার্থীর আবেদন পেয়েছে। কিন্তু যথার্থ ই উপযুক্ত কোয়ালিফিকেশন যাদের আছে, সে তাদের নিয়োগ করবে না। বেছে বেছে এমন সব প্রার্থী নিয়োগ করা হবে, যোগ্যতায় যাদের ত্রুটি আছে, কারণে অকারণে সেই অজুহাতে তাহলে বরখাস্ত করা যাবে।

দূর্জন লোকেরা বলে সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে বাইরে উষ্মা দেখা দিয়েছে। তাই অভ্যন্তরেও যাতে তেমন কোন সম্ভাবনা না থাকে— তারই ব্যবস্থা করা দরকার। এই জন্য এই পদ্ধতিতে টীচার নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

স্থানীয় কয়েকজন অধ্যাপক সতীর কাছে আসলেন তাঁদের এক সহকর্মীর স্ত্রী যিনি কিছুকাল ঐ স্কুলে চাকরী করেছেন, তাকে কেন স্থায়ীপদে পুনরায় না নিয়ে, অন্য প্রার্থী নিয়োগ করা হচ্ছে, তারই দাবী জানাতে।

অকাট্য যুক্তি। সতী এই সম্বন্ধে অভয়কে জিজ্ঞেস করল। তিনি জানালেন কলেজের সঙ্গে সংলিষ্ট কোন প্রার্থীকে আর নিয়োগ করা হবে না। কারণ স্কুলের প্রাইভেসি তাতে নষ্ট হয়।

কথাটা সতী উপলব্ধি করতে না পারায় অভয় চালিহা ব্যাখ্যা করে বলে দিল যে স্কুলে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবরাখবর সেই অধ্যাপক পত্নী কর্তৃক কলেজ সীমানা পর্যন্ত পেঁাছুত। ফলে স্কুলের আভ্যন্তরীন সমস্ত ব্যাপার কলেজের সবাই জানতে পারত।

সতী বিস্মিত হয়ে উত্তর দিয়েছিল—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না যে এমন কি ব্যাপার ঘটতে পারে যা কলেজের অধ্যাপকরা জানাতে আপনাদের লজ্জা বা বিরক্তির কারণ ঘটতে পারে।

অভয় রেখে ঢেকে যা ব্যক্ত করতে চাইছিলেন তা যেন আর গোপন রাখা গেল না। উষ্মা প্রকাশ করে সে উত্তর দিল—আপনি

যেন কিছুতেই বুঝতে চান না। এই যেমন আমি কবে কখন স্কুলে গেলাম বা কোন ক্লাসে গেলাম, সে সব ব্যাপার তারা জানতে পারে। কোন টীচার কখন স্কুলে আসে ইত্যাদি খবরাখবর নিয়ে তারা নানা রকম বিদ্রূপপাত্মক কথা বলে থাকেন।

ঘা টা কোথায় বুঝতে এবার দেরী হল না। কারণ কর্মস্থলের মাটি স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে অভয় সম্বন্ধে এ ধরণের নানা কথা নানা জনের থেকে তাকে শুনতে হয়েছে। এমন কি স্কুল প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বারদের থেকেও। সবাই সতীকে সতর্ক করে দিয়েছিল এই ব্যাপারে। এই কারণে সতী প্রথম হতেই সতর্ক ছিল।

—সে উত্তর দিল বে-আইনী কাজ যদি আমরা না করি, তবে আমরাও অপরের সমালোচনার বিষয় বস্তু হব না। সেক্রেটারীর যখন তখন স্কুলে বা ক্লাশে যাওয়ার তো কোন কারণ নেই।

সেক্রেটারীর সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার হয়ত অফিস সংক্রান্ত কিছু যোগাযোগ এর প্রয়োজন আছে। তা আপনি স্কুল ছুটির পর বা কোন ছুটির দিনে অফিসে এসে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন। ছাত্রীদের ক্লাশ রুমে তো আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

অভয় একটু অপ্রস্তত হয়ে বললেন—আগের প্রধানা শিক্ষিকা তো আপনার মত অভিজ্ঞা ছিলেন না। তাই আমাকেই সব কিছু দেখা শোনা করতে হত। স্কুলের পড়াশুনা হচ্ছে কিনা তাও আমাকেই দেখতে হ'ত। আফটার অল আমিই তো স্কুলের সেক্রেটারী।

—আপনি ভুল বুঝেছেন। স্কুলের রেজাণ্ট যদি খারাপ হয়, স্কুলে যদি নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব হয়, তবে তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য প্রধানা শিক্ষিকা। স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে যদি কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তবে স্কুল পরিচালক কমিটিই তার জন্য দায়ী। আপনাকে কেউ কোন ব্যাপারে দায়ী করতে পারে না।

সতী বুঝলে অধ্যাপক পত্নীকে নাকচের প্রধান কারণ কি। তবু

অধ্যাপক পত্নীর পক্ষ নিয়ে কয়েকজন অধ্যাপক ও অধ্যাপক পত্নীরা যখন সতীর কাছে সুপারিশ করতে এল, তখন তাদের একটা দরখাস্ত পাঠাতে বললে।

মানুষ যখন স্বার্থের রথ চালিয়ে যায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তখন মানুষ অনেক নীচে নেবে যেতে পারে, অনেক অন্যায় কাজ করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

তেমনি অধ্যাপক পত্নী তপতী সেক্রেটারীকে সম্বোধন করে কোন দরখাস্ত না দিয়ে প্রধানা শিক্ষিকা, প্রেসিডেন্ট ও অপর একটি দরখাস্ত ডি, আই, এর কাছে পাঠালো।

দরখাস্তে সে মনের ঝাল মিটিয়েছে সেক্রেটারীও সহ শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে। কে কত কম যোগ্যতা নিয়ে এই স্কুলে শিক্ষকতা করছে, এবং তাদের অধ্যাপনার ত্রুটি বিচ্যুতি সবই সে তুলে ধরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারীর যখন তখন স্কুলের প্রাইভেসী নষ্ট করে, ক্লাশ রুমে, ষ্টাফ রুমে আনাগোনার কথাও জানাতে ভোলেনি।

ফল হল খারাপ। স্কুলের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি এভাবে ডি, আই, এর সামনে তুলে ধরায় প্রেসিডেন্ট হলেন ক্ষুব্ধ।

সহ শিক্ষিকারা পূর্বাহ্নেই তপতীর প্রতি তেমন তুষ্ট ছিল না, কারণ ষ্টাফ রুমে শিক্ষিকাদের আলোচ্য বিষয় নাকি সে প্রধানা শিক্ষিকার কাছে জানিয়ে দিত। তাছাড়া স্বভাবতঃই মেয়েদের মধ্যে কমপ্লেকসিটিটা একটু বেশী।

তপতী অধ্যাপক পত্নী। এই কারণে তার সহকর্মীদের তার প্রতি একটা কমপ্লেকসিটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো—তাকে দেখলে।

তাদের মধ্যে কেউ শিক্ষকের স্ত্রী, কেউ সাধারণ কেরাণীর স্ত্রী, অন্যান্যরা কুমারী। স্বভাবতঃই তপতীর প্রতি তাদের একটা কমপ্লেকসিটি ছিল। সুযোগের অভাবে তারা তপতীকে হুল ফোটাতে পারছিল না।

কিন্তু তপতীর সামান্য ভুলে আগুনে যেন ঘি আহুতি দেওয়া হল। সহকর্মীদের যোগ্যতার সমালোচমা করে প্রেসিডেণ্ট ও ডি, আই অফিসে চিঠি দেবার কোন অধিকারই তার নেই। এইভাবে সহকর্মীদের উর্ধতন ব্যক্তিদের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার অপরাধে তারা সকলে এক জোটে তাদের টীচারর্স কাউন্সেলে একটা মিটিং এ স্থির করল যে – যেহেতু তপতী তাদের এইভাবে অযথা হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছে, সেইজন্য তাকে পুনঃ নিয়োগপত্র দিলে সব শিক্ষক শিক্ষিকা এক যোগে পদত্যাগ করবে। এই মর্মে একটা চিঠি তারা সতীকে দিল।

সতী সেই চিঠি নিয়ে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করল। প্রেসিডেণ্ট তপতীর এই ধরণের ঔদ্ধত্যে পূর্বেই ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। কারণ সামান্য শিক্ষিকা হয়ে স্কুলের দোষ ত্রুটি ডি আই র সামনে তুলে ধরার ঔদ্ধত্য অমার্জনীয়। সুতরাং শিক্ষিকাদের যুক্ত আবেদনকে অগ্রাহ্য করতে তিনিও রাজী নন্।

মানুষের জীবনের অতি সামান্য ছোট্ট ভুলই হয়ত অভিশাপরূপে দেখা দেয়। নতুবা সতীর ইচ্ছে ছিল তপতীর ন্যায় সঙ্গত দাবীকে জি, বি দ্বারা অনুমোদিত করাবে।

কিন্তু তপতীর এই ভাবে দরখাস্ত লেখার ত্রুটিতেই হাতের পাকা ফলটা আর তার খাওয়া হল না। ঝরে নষ্ট হয়ে গেল।

স্কুলের শৃঙ্খলা সতী ফিরিয়ে আনতে বিলম্ব করেনি। সহরের লোকেরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। রুটিন করে মেয়েদের পড়াশুনা সুরু হল।

স্কুলের ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গেটে তালা পড়ে যায়, যাতে ছাত্রীরা যত্র তত্র বের হয়ে যেতে না পারে। অবাঞ্ছিত জনও স্কুলে ভিড় করতে না পারে।

অফিসে নতুন করে খাতাপত্র কিনে হিসাবপত্র আয় ব্যয় সব রাখার ব্যবস্থা করা হ'ল।

জগাই পণ্ডিত প্রথম কয়দিনই নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে এসেছে। তার পরই দেখা গেল জগাই মাধাই স্কুলে আসতে দেরী করছে।

সতী প্রথম দিন দুই মিষ্টি মুখে তাদের এই চরিত্র সংশোধিত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু বুঝল মিষ্টি ব্যবহারের লোক এরা নয়। তাই সতী এবার শক্ত দাবাই এর ব্যবস্থা করল।

সতী জগাইকে জানাল এভাবে স্কুলের শৃঙ্খলা নষ্ট করলে তো তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে হবে জি বির কাছে।

স্কুলের কেরাণী না থাকায় অভয় জগাই মাধাইকে দিয়েই স্কুলের কেরাণীর কাজ করাচ্ছিলেন। তাই তারা ভেবেছিল, এরই সুযোগে তারা স্কুলের নির্দিষ্ট আইন কানুনের আঁওতায় পড়বে না। কিন্তু সতীর এটিটিউডে তাদের সম্বিত ফিরে এল।

জগাই কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল—অম্বালিকার কেস্ সম্বন্ধে থানার দারোগা ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই আস্‌তে দেরী হয়ে গেল।

—থানার দারোগাকে জানিয়ে দেবেন আপনার স্কুলের চাকরীটাই আপনার প্রাইমারী কাজ। অম্বালিকার ব্যাপারে আপনার করণীয় কিছু নেই।

তবু কোন কারণে স্কুলের হিতার্থে যদি আপনার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হয়—তা আফটার স্কুল টাইমে যেন ব্যবস্থা করা হয়।

সতী খবর পেয়েছে মাধাই অনেক টিউশনি করে। আর জগাই আড্ডা দিয়ে বেড়িয়েই অযথা দেরী করে স্কুলে আসে।

জগাই মাধাই বুঝলো এবার শক্ত হাতে হাল ধরা হয়েছে। তাই নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করতে সুরু করল মনকে তিক্ততার বিষে পূর্ণ করে। এবং মনে মনে সতীকে উচ্ছেদের ফন্দী ফিকির খুঁজতে লাগল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সতীর কোন ত্রুটিই তারা খুঁজে পেল না।

সতীকে আর এক বিপদের সম্মুখীন হতে হল। ডেইলী

কালেক্শন ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে সেক্রেটারীর কাছে জমা হয়। এ কি ধরণের ব্যবস্থা।

সহরে যেখানে এত ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিস, সেখানে বে-আইনী ভাবে স্কুকের টাকা কেন সেক্রেটারীর কাছে রাখা হচ্ছে।

সতীর মনে হল এটাই প্রতিটি সমস্যা জড়িত স্কুলের প্রধান ত্রুটি। এই বিষয়ে সতী প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে জানালো—এই টাকার যদি কিছুমাত্র গোলমাল হয়, তবে সতী তার জন্য দায়ী হবে না।

প্রেসিডেন্ট সতীকে জানালেন গলদ এই স্কুলে অনেক। তবে অতি সাবধানে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। ঝড়ের বেগে এত দিনের কাস্টমকে নাড়া দিতে গেলে হয়ত ভেঙ্গে পড়ে সবই তছনছ হয়ে যাবে। তাই ধীরে ধীরে সুকৌশলে সবার মুঠো হতে সব কিছু আস্তে আস্তে খুলে নিতে হবে।

পরন্তু আপনি পরবর্তী জে. বি. র মিটিং এ ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলবার প্রস্তাব করবেন। তখন আমরাও অভয়কে চাপ দিতে পারবো।

সতী উত্তর দিল—অভয়কে প্রশ্ন করে সে উত্তর পেয়েছে কেরানী না থাকায় স্কুলের একাউন্ট ঠিক নেই। এবার অডিটের আগে কেরানী নিযুক্ত করে ব্যাঙ্কে সব টাকা জমা দেওয়া হবে। তার কাছে সব টাকাই জমা আছে।

সতীর প্রাক্তন সহকর্মীদের সাবধান বাণী স্মরণ করে সতী একদিন ডেইলী কালেক্শন্ খাতার হিসাব পরীক্ষা করতে গেলে দেখা গেল যোগে মস্ত ভুল। সতীর মাথা ঘুরে গেল।

কারণ কালেক্শন্ রিসিভ করছে জগাই। স্কুলে কোন রকম ক্যাস বাক্স না থাকায় সতী স্কুল কালেক্শনের টাকায় হাত দেয় না। জমা যায় প্রতিদিন অভয়ের বাড়ীতে। কিন্তু প্রধানা শিক্ষিকা হিসাবে সেই জমার খাতায় সই দিতে হয় সতীকে।

সতী হিসাবের গোলযোগে জগাই এর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সে অপ্রস্তুত হয়ে বলে—ভুল হয়ে গেছে।

—কিন্তু এই ভুলের মাশুল কে দেবে ?

খানিকক্ষণ মৌন থেকে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জগাই পণ্ডিত বলল —কে আর দেবে ? আমাকেই দিতে হবে—আমিই দেব।

সতী জানে ধরা যখন পড়েছে একবার, তখন এই বিষধর সাপ ছোবল্ মারবার চেষ্টা করবেই।

অচিরেই প্রমাণ হলো সতীর অনুমান মিথ্যে নয়। সেইদিন রাত ১১॥ টার সময় জগাই টাকার একটা থলি ও হিসাবের খাতা নিয়ে সতীর কোয়ার্টারে হাজির হয়ে বললে।

—সেক্রেটারী বলেছেন টাকার দায়িত্ব তিনি আর রাখতে পারবেন না। এবং আমিও হিসাবপত্র আর রাখতে পারব না! সুতরাং আপনি টাকা ও হিসাব খাতাটা নিয়ে একটা রসিদ দিন।

সতী বুঝল নরম হলে এ ক্ষেত্রে চলবে না। তাই সে-ও শক্ত হয়ে উত্তর দিল—এসব দায়িত্ব তো আমার নেবার কথা নয়। প্রধানা শিক্ষিকার কর্ম তালিকার মধ্যে কেরানীর কাজ করা বা স্কুলের কালেক্‌শনের টাকা জমা রাখার দায়িত্ব তার নয়।

আপনারা এসব রাখতে না পারলে প্রেসিডেন্টের কাছে জমা দিন। কাল ভোরেই আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে এ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করবো। এর কোনটাই আমি গ্রহণ করতে আইনতঃ বাধ্য নই।

সতী তার প্রাক্তন অভিজ্ঞতা হতে এই টাকা সংক্রান্ত ব্যাপারে সেক্রেটারী যাতে তাকে বিপদে ফেলতে না পারে, তার জন্য জগাই পণ্ডিত প্রতিদিন সেক্রেটারীর হাতে যে টাকা জমা দিচ্ছে—তার একটা রসিদ লিখিয়ে এনে দিত সতীকে।

জগাই ও অভয় ভেবেছিল তাদের এই দ্বৈত নন-কোয়াপরেশনের হুমকিতে সতী বোধ হয় ঘাব্‌ড়ে গিয়ে—হিসাবের গড়মিলের মোটা

অংশটার ঘাট্‌তি নিজেই দিতে রাজী হবে। এতে তাদের পোয়া বার হবে।

কিন্তু ফল দেখা গেল উল্টো। সতী রুখে দাঁড়াল। যারা দুর্বল লোক, যাদের নিজেদের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সতত সজাগ, প্রতিরোধ করে দাঁড়ালে, তারা আপ্‌না হতে লজ্জাবতী লতার মত গুটিয়ে যায়। তাই সতীর এই মূর্তি দেখে জগাই পিছিয়ে গেল।

পরদিনই সতী প্রেসিডেন্টকে পূর্ব দিনের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জানালো। প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীকে ও জগাই পণ্ডিতকে ডাকিয়ে নিয়ে ধমক দিয়ে বললেন—

—নিজেদের কোন ত্রুটি হলে, তা সংশোধন করে নেওয়া উচিত। তা না করে আপনারা ভদ্রমহিলাকে জব্দ করবার ষড়যন্ত্র করছেন। অভয়বাবু, আপনি আর বিলম্ব না করে এখনই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখবার ব্যবস্থা করুন।

জগাইবাবু, যে টাকার গরমিল হয়েছে, সেই টাকাটা আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একাউন্টে জমা দিয়ে দিন্।

সতীকে তিনি বল্লেন—সম্ভব হলে হিসাব পত্রের দায়িত্ব জগাইবাবু হতে আপনাদের সায়েন্সের টীচার শ্রীধরবাবুকে দিন্। উনি গণিতের শিক্ষক হিসাব নিকাশে তাঁর ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

সতী জানতো শ্রীধরবাবুর সঙ্গে অভয়বাবুর বনিবনা তেমন নেই। কারণ তিনি সৎ সাধু সজ্জন ও স্পষ্টবাদী। তাই অভয়বাবুর সমালোচনা করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। তাছাড়া জগাই মাধাই এর মত অগ্রিম মাইনার ভগ্নাংশের জন্য তাঁকে কখন অভয়বাবুর কাছে হাত কচলাতে হয় না।

সতী স্কুলের পুরাণো চিঠিপত্র পড়ে দেখতে পেলো—প্রতিষ্ঠানের দুই প্রধানের মধ্যে সদ্ভাব না থাকায়, স্কুলের উন্নতি প্রচুর ব্যাহত হয়েছে।

লাইব্রেরীর জন্য বার্ষিক বই কিনবার জন্য যে টাকা পাওয়া

যায়—বই না কেনায় সেই টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। তা আর নেওয়া হয়নি। ডি, পি, আই হতে স্কুলের হোষ্টেল তৈরী করার জন্য অর্থ দিতে চেয়ে ছিল, কিন্তু সে অর্থও গ্রহণ করবার সুবিধা স্কুল কমিটি গ্রহণ করতে পারেনি।

অথচ স্কুলের সংলগ্ন হোষ্টেলের জন্য স্কুলেরই বিরাট জমি পড়ে আছে। এমন কি স্কুল গৃহ তৈরী করার জন্যও যে টাকা পাওয়া যায়—তাও গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, উপযুক্ত প্ল্যান ইত্যাদি দাখিল না করায়।

এইভাবে স্কুলের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন খাতে যে সব টাকা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবই নষ্ট হয়েছে।

এই সব চিঠি পত্র পড়ে সতীর দুঃখ হল। কারণ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে জেনেছে এদের অনেকেই রেফিউজি ছাত্রী। কত ছাত্রী দূর প্রান্ত হতে দৈনিক ৪।৫ মাইল পথ হেঁটে এই স্কুলে আসে।

এদের সাংসারিক দারিদ্র্য এদের কাবু করতে পারেনি। একাগ্রতা ও অধ্যবসায় তাদের কায়িক ও শারীরিক সব দুঃখ কষ্টকে ভুলিয়ে জ্ঞানের আলোর আশায় টেনে এনেছে।

তাই এইসব ছাত্রীরা অনেকেই হয়ত দুমুঠো মুড়ি ও জল খেয়ে মাইলের পর মাইল ছুটে আসে এই একমাত্র বালিকাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

কিন্তু যে আশায় তারা এত দুঃখ করছে, তাদের অভিভাবকরা কষ্ট করে স্কুলের বেতন জোগাড় করছে, তাদের সেই উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হচ্ছে—এই চিন্তাই সতীকে ব্যথিত করে।

উপযুক্ত শিক্ষিকা নেই। পড়াবার উপযুক্ত এ্যাপারেটাস্ নেই, ছাত্রীদের পড়বার উপযুক্ত লাইব্রেরী নেই, খেলবার কোন রকম ব্যবস্থা নেই, কোন রকম ইন্‌ডোর বা আউটডোর খেলার ব্যবস্থা নেই। এক্সট্রা কারিকুলার একটিভিটির কোন ব্যবস্থা নেই।

প্রাণ চঞ্চল এই বালিকাদের প্রাণোচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশের কোন

ব্যবস্থাই নেই। সব দ্বার যেন কেমন রুদ্ধ। পাঠ্য পুস্তকের বাইরে তাদের করবার কিছুই নেই। তবু তারা আনন্দিত। লেখা পড়া শিখে, তারা বড় হবে, পরিবারকে সাহায্য করবে, স্বাবলম্বিনী হবে। কত আশা, কত রঙ্গীন স্বপ্ন ঘুমিয়ে আছে তাদের ছোট ছোট বুকে।

তাদের সরল মনের স্পর্শ সতীকেও এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য প্রেরণা দিল। সতী ভাবলো চারিদিকে মাল মশলা যখন ছড়িয়ে রয়েছে, তা একত্রিত করে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে, তার আবাল্যের সাধ পূর্ণ হবে।

অলক্ষ্যে হেসেছিলেন বিধাতা পুরুষ। সতী স্কুলের উন্নতির জন্য রাতদিন শ্রম করতে লাগল। প্রেসিডেন্টের সহযোগীতায় সতীকে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একটা কোয়ার্টার ভাড়া করে দেওয়া হল। কয়েক মাস সতীর কাজকর্ম ভাল ভাবেই চলছিল।

শ্রীধরবাবু কেরানীর পদে অফিসিয়েটিং করার পর হতে মাধাই এর অসুবিধা হয়ে পড়ল। অগ্রিম টাকা আর পাওয়া যায় না। তাই বড়ই অসুবিধা হয় তাদের। অভয়বাবুও শ্রীধরবাবুকে পছন্দ করেন না।

এত বছর কেরানীর যে পদটি খালি ছিল—এবার সেই শূন্য পদ পূর্ণ করবার জন্য অভয়বাবু যেন বড় তৎপর হয়ে উঠলেন। অডিটার আসছে চিঠি এসেছে।

তাই তার আগে খাতা পত্র গুছিয়ে রাখতে হবে। অভয়বাবু তাঁর যোগ্য সাকরেদ একজন ঝানু কেরানী আনলেন। যিনি সব দিক দিয়েই অতি দক্ষ। টাইপও জানেন, স্কুলের চিঠিপত্র লেখার রীতিনীতিও জানেন, হিসাবে তো অতি পক্ক।

স্কুলের জন্য তাকে এপোয়েন্টমেন্ট দেবার পূর্ব হতেই অভয়বাবু তাকে দিয়ে স্কুলের হিসাব পত্র মিলাবার কলা কৌশলটা শিখিয়ে সেই ভাবে করাচ্ছিলেন!

অভয়বাবু কেরানী চৈতন্যবাবুর প্রশংসায় মুখর। বার বারই

তিনি সতীকে শোনাচ্ছেন—এমন অভিজ্ঞ কেরানীর হাতে স্কুল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারবেন। একদিকে টাইপিষ্ট, কেরানী। স্কুলের নাড়ী নক্ষত্র সবই চৈতন্যবাবুর পঞ্চ অঙ্গুলীতে বাঁধা। সুতরাং কেরানী যদি রাখতেই হয়, তবে এমনি একজন কেরানীরই প্রয়োজন।

কেরানী পদের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে বলা সত্ত্বেও অভয়বাবু তা দেন্‌নি। তবু লোক পরম্পরায় এই পদের খবর পেয়ে কয়েকজন প্রার্থীই দরখাস্ত করেছিলেন।

তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হতভাগ্য ব্যক্তি—যাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন জমিদার। কিন্তু রাজনৈতিক পাশা খেলার ক্রীড়ণক আজ তিনিও। পূর্ব পুরুষের কিছুই আজ আর তাঁর মধ্যে নেই।

কেবল তাঁর চেহারায় আজও ফুটে রয়েছে সেই অতীত ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি। তাঁর মিষ্টি গলার সুরে ধরা রয়েছে পূর্ব পুরুষের সঙ্গীত প্রিয়তার চিহ্ন।

ভাগ্যের পরিহাসে এ হেন ব্যক্তিকেও চাকরীর কিউতে সারি দিতে হচ্ছে। এই ভাগ্য বিড়ম্বিত ব্যক্তি কুমার দীপনারায়ণ রায়ের পক্ষে সহরের অনেকেই সতী ও প্রেসিডেণ্টকে সুপারিশ করেছে।

দীপনারায়ণ রায় আজ তার নামের আগে বংশগত ঐতিহ্যের নিদর্শন 'কুমার' শব্দটা ছেটে দিয়েছেন। যেখানে আজ তিনিও সাধারণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, —সেখানে বংশগত এইসব উপাধি কেবল হাস্যাস্পদই নয়, এ যেন আজ তাঁর লজ্জার কারণ।

দীপনারায়ণ বাবু নিজে অভয়বাবুর কাছে গিয়েছিলেন। অভয়-বাবু তাঁকে মুখের উপর বলেছেন—আপনাদের দুধ ক্ষীরের শরীরে কেরানী গিরির কৃচ্ছ্র সাধন সম্ভব নয়।

পরন্তু কার্ত্তিকের মত চেহারা আছে, গলাও যখন আছে, তখন ঐ লাইনেই একবার চেষ্টা করে দেখুন। ওখানেই আপনার কপাল খুলবে।

এ লাইনে অভিজ্ঞতাও নেই, তাছাড়া এসব ঝঞ্ঝাটের কাজ আপনার দ্বারা হবে না।

তবু দীপনারায়ণ বলেছিলেন—একবার সুযোগ দিন, চেষ্টা করে গড়ে পিটিয়ে নিজেকে তৈরী করে নেবো।

কিন্তু অভয়বাবুর মনে তিনি আঁচড় কাট্‌তে পারেননি। সতী প্রেসিডেণ্টকে বল্লেন—অভয়বাবুর বহু প্রশংসিত চৈতন্যবাবুকে কেরানীর পদে নিয়োগ করতে আমি ভয় পাচ্ছি। শুনেছি কয়েক জায়গা হতে তাঁর চাকরী গেছে।

কর্ত্তৃপক্ষ নানা অছিলায় নিষ্কৃতি পেয়েছে এমন চৌকস কেরানী হতে। এসব কাহিনী অভয়বাবুই জানিয়েছেন।

প্রেসিডেণ্ট বল্লেন—দীপনারায়ণ বাবুকে আপনার কেমন মনে হয়? তিনিও একজন প্রার্থী। তাঁর সম্বন্ধে সবার মুখেই প্রশংসা। আমি নিজে তাঁকে যতটুকু জানি—তাতে মনে হয় এই সব পরিবারের ছেলেরা কখনও কোন নোংরামীর মধ্যে নিজেকে জড়াবে না।

আপনি অন্ততঃ নির্ভয়ে এঁর উপর স্কুলের হিসাব নিকাশের দায়িত্ব দিতে পারবেন। জি, বি র, কয়েকজন মেম্বারও এঁর পক্ষে আমাকে সুপারিশ করে গেছেন।

আমার তো মনে হয় একমাত্র অভয়বাবু ছাড়া চৈতন্যবাবুকে আর কেউই সমর্থন করেন না।

অভয়বাবু বার বার আমাকে বলেছেন—আপনি যদি এঁকে অনুমোদন করেন, তবে কেউ-ই এঁকে নাকচ করতে পারবে না। কারণ কেরানীর প্রয়োজন প্রধানা শিক্ষিকার সহায়তার জন্যে।

সুতরাং আপনি যদি দীপনারায়ণবাবুর নাম প্রস্তাব করেন, তবে সকলেই তা সমর্থন করবেন, এবং আমাকেও অভয়বাবুর রোষের কারণ হতে হবে না।

অভয়বাবু চৈতন্যবাবুকে এমন ভাবে কথা দিয়েছেন যে তার

চাকরী সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত, কিন্তু একদিকে অভয়বাবুকে আমি ভয় করি। কখন তিনি কি গোলমাল বাঁধিয়ে অম্বালিকার মত আমাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলেন, তার উপর চৈতন্যের উদয় হলে তো আরও ভাল হয়। দুই দোসরের মহামিলন হলো।

নির্দ্দিষ্ট দিনে জি, বি, র মিটিং এ অভয়বাবু শতমুখে চৈতন্যবাবুর প্রশংসায় মুখর। সতী নীরব রইল।

এমন সময় প্রেসিডেন্ট দীপনারায়ণ রায়ের দরখাস্ত খানা বের করে বল্লেন—আরও একজন প্রার্থী আছেন। যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা হয়ত তাঁর নেই। কিন্তু এই রকম একজন লোককে এই চাকরীটা দিলে একটি পরিবারের উপকার হবে।

তাছাড়া নবীশ বলেই দীপনারায়ণবাবুর থেকে ভাল কাজের আশা করা যায়। আমার তো মনে হয় কোন ঝানু কেরানী অপেক্ষা নবীশ কেরানীই বেশী নিরাপদ—আপনারা সকলে কি বলেন ?

জি, বি, র সব মেম্বারই প্রেসিডেন্টের কথা অনুমোদন করে তাঁর পক্ষে ভোট দিলেন। সতী নীরব। অভয়বাবু একাই সরবে চৈতন্যের গুণগানে মুখর হয়ে উঠল।

প্রেসিডেন্ট হেসে উত্তর দিলেন—অতগুণ আছে বলেই তো এঁকে স্কুলের চাকরীতে ঢুকাতে সাহস পাচ্ছি না। এমনিতেই এই স্কুলে অনেক জট পড়ে গেছে। কবে যে এসব জট খোলা সম্ভব হবে জানি না। তাই নতুন করে আর জট পাকাতে ইচ্ছা করি না।

অভয়বাবুর আশার শেষ শিখাটুকুও যখন নিভে গেল, তখন তিনি নিমজ্জিত স্রোতে ভাসমান কুটোটুকুকে শেষ অবলম্বন স্বরূপ ধরে বাঁচবার জন্য বল্লেন—কিন্তু চৈতন্যবাবুর এই স্কুলে চাকরী হবার সম্ভাবনায় আমি যে অগ্রিম তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছি। এখন তো তাঁকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করল—কিন্তু জি, বি, র অনুমোদন না নিয়ে একজনকে দিয়ে কাজ করাবার অনুমতি কে

আপনাকে দিয়েছে ? যে-ই দিয়ে থাক্—চৈতন্যবাবুর পারিশ্রমিক স্কুল ফাণ্ড হতে দেওয়া হবে না। ইতিপূর্বেও আপনি যথেচ্ছ ভাবে স্কুলের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। কিন্তু স্কুল কমিটি আর তা বরদাস্ত করবে না।

চৈতন্যবাবুর আবেদন পত্র অগ্রাহ্য হওয়ায় অভয়বাবুর চৈতন্য হল স্কুলের আবহাওয়া একই ভাবে বয়ে চলছে না। তাই এতটা রিস্ক নেওয়া তার উচিত হয়নি।

অভয়বাবুর সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল মৌন সতীর উপর। সতী যদি একটু মুখ খুলত, তবে কখনই এমন অঘটন ঘটতে পারত না। সেই আক্রোশে অভয় চালিহা মনে মনে সতীর বিরুদ্ধে ছুরিতে শাণ দিতে লাগল।

বর্ষার থম্‌থমে মেঘের মত তার মুখ হল। এতটা লোকসানের জন্য সতীই দায়ী। শিক্ষা ও কৃষ্টির বর্ম্মণে ঢাকা থাকে না অভয়ের গহন মনের ছবি। তাই সে বিরক্ত হলো সতীর উপর। পরদিন অভয় সতীর সঙ্গে দেখা করে বলল—

—আপনাকে একটা কথা জানাতে এসেছি। আপনি যদি আমার কথা মত চলেন, তবে কেউ আপনার কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবে না।

যদি আপনি আমার কথার বিরুদ্ধাচারণ করেন, তবে আপনার যে সর্বনাশ হবে—তার থেকে কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না।

যেমন হয়েছে অম্বালিকার অবস্থা। সেটা বিবেচনা করেই আপনি ভবিষ্যৎ কর্ম পদ্ধতি স্থির করবেন।

আপনার জন্যই আমার কতকগুলি অর্থ দণ্ড ,দিতে হচ্ছে। আপনি যদি গতকাল নীরব না থেকে চৈতন্যকে সমর্থন করতেন, তবে দীপনারায়ণকে কেউ ঢুকাতে পারত না।

—তা কি করে সম্ভব ? স্বয়ং প্রেসিডেন্ট যার নাম প্রস্তাব করছেন, তার বিপক্ষে অন্যান্য মেম্বাররা কখনই তাদের মতামত দিতেন না।

অন্যান্য মেম্বার বা প্রেসিডেন্টের মতামতে কি যায় আসে? কাজ করাবো আমরা চৈতন্যকে দিয়ে। সুতরাং আমাদের নিজেদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে চৈতন্য আমাদেরই হওয়া দরকার।

—একথাটা জেনে রাখুন অভয়বাবু, কার কোন রকম অন্যায় কাজের সমর্থন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এ জন্য যত গুরু দণ্ডই আমাকে ভোগ করতে হোক্ না কেন।

ধর্ম পথে যে চলবে, সং সাধু ভাবে কাজ করবে, আমার পূর্ণ সহযোগীতা সে পাবে। কিন্তু অন্যথা ঘটলেই ফলও অন্যরূপ হবে। কথায় বলে ধর্মের কল আপনিই নড়ে।

—তবে আপনি চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

অভয় চালিহার আল্‌টিম্যাটাম্ সতী পেলো, সতী জানে অভয়ের সব রকম গুণই আছে। তাই এ খবরটা সতী বহু কানে না পৌঁছিয়ে —কেবল প্রেসিডেন্টকে জানালো।

প্রেসিডেন্ট কথাটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে হেসে কথাটা উড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু সতী দেখলো পরিস্থিতি যথার্থই সুবিধার নয়। সতীর কাজকর্ম করে দিতো স্কুলের দারোয়ান। এজন্য অবশ্য সতী তাকে আলাদা টাকা দিতো। বিশ্বাসী কোন ঝি বা লোক পাওয়া না যাওয়ায় এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্টই সেক্রেটারীর মারফৎ এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

জগাই পণ্ডিতকে সরিয়ে হিসাব নিকাশ শ্রীধরের হাতে তুলে দেওয়ায় অভয়, জগাই, মাধাই এই ত্রিমূর্ত্তির সতীর উপর প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। তারপর তাদের শেষ আশার রশ্মি চৈতন্যর নিয়োগ পত্রও যখন বাতিল হয়ে গেল, তখন এদের ক্রোধে ঘৃতাহুতি পড়ল।

হঠাৎ দেখা গেল সতীর সেই একমাত্র হেলপিং হ্যাণ্ড বাহাদুর যেন কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। স্কুলের কাজের পর সে খুশী

মত কোথায় বেড়িয়ে বেড়ায়, সতীর কাজে কোন রকম সাহায্য করে না।

সতীর ব্যক্তিগত কাজকর্মে সে হঠাৎ অবহেলা স্নুরু করল। এমন কি প্রায়ই সে রাত্রে বাসায় ফেরে না। ফলে এই বিদেশে অত বড় কোয়ার্টারে সতীকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে একা থাকতে হতো।

পূর্বে সতীর সামান্য বকুনীতে সে লজ্জাবোধ করত। কিন্তু ইদানীং তাকে তিরস্কার করলে, তা যেন তার কানে পৌঁছাত না, সে যেন পাষাণ।

ভৃত্যের ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়। প্রেসিডেণ্টকে সতী এ ব্যাপার রিপোর্ট করায়, তিনি রাত্রে থাকবার জন্য তাঁর বিশ্বস্ত একজন লোককে পাঠালেন। এবং স্কুলের দারোয়ানকে ডেকে ধমক দেওয়ায় সে চুপ করেই রইল।

সতী তারপর লক্ষ্য করল রাত্রে তার কোয়ার্টারে ঢিল পড়তে স্নুরু করেছে। দারোয়ান যেন অভয় চালিহার স্পাই এর কাজ করছে। সতীর কাছে কখন কে আসছে ও কি কথা হচ্ছে আড়াল হতে শুনে সে সতীর অনুমতি বিনাই সব কাজ ফেলে, তা রিপোর্ট করতে ছুটে যায় অভয়বাবুর বাড়ীতে।

সতী তাকে বার বার নিষেধ করা সত্বেও—কেউ এলে সে ছুটে বারান্দায় এসে চুপ করে আড়ি পাতে।

সতী সমস্ত ব্যাপারই প্রেসিডেণ্টকে রিপোর্ট করত। কিন্তু ফল তাতে উত্তরোত্তর খারাপ বই ভাল হত না। পরন্তু সতীর কাছে তার জীবন বিপন্ন এই রকম নানা উড়ো চিঠি আসতে লাগল।

প্রেসিডেণ্ট পড়লেন মহা সমস্যায়। যেদিন অভয় চালিহা তাকে হুমকি দিয়েছিল, সেইদিনই সতী একটা পদত্যাগ পত্র প্রেসিডেণ্টকে দিয়ে তাড়াতাড়ি তার রেজিকনেশন্ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল।

কিন্তু সতী এই স্কুলে অল্প কয়েক মাস জয়েন করেই এরই মধ্যে

স্কুলের প্রভূত উন্নতি করায় প্রেসিডেণ্ট জে, বি, র মেম্বাররা বা স্থানীয় লোকেরা কেউ-ই চায়নি যে সতী চলে যায়। পরন্তু সকলেই চেয়েছিল সতীকে যদি ধরে রাখা যায় তবে হয়ত স্কুলটার আরও উন্নতি হবে।

স্থানীয় কলেজের ছাত্ররা যখন লোক পরম্পরা শুনতে পারলো যে সতী চলে যাবে মনস্থ করেছে—তখন তারা অভয়ের কাছে যেয়ে তাকে হুমকী দিয়ে বল্ল—

—আপনি এক্ষুনি পদত্যাগ পত্র লিখে দিন্ আমাদের কাছে। আপনার মত সেক্রেটারী গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যাবে। কিন্তু সতী সেনের মত শিক্ষিকা হাজারে একটি দুর্লভ। আপনার জন্য আমরা সতীদিকে হারাতে পারি না। অভয় ভীরু। তাই ছাত্র ইউনিয়নের ধমকে তিনি ঘাবড়ে যেয়ে বল্লেন—আমার পদত্যাগ পত্র তোমরা নিয়ে যাও বাবারা, কিন্তু আমাকে রেহাই দাও।

তারা আরও শাসিয়ে এল। আবার যদি আপনার নেপথ্য ষড়যন্ত্রের কোন রকম গন্ধ আমরা পাই, তবে জানবেন আপনার ঘাড়ের উপর মাথা আর আমরা রেখে যাবো না।

পদত্যাগ পত্রটা নিয়ে তারা সোল্লাসে যখন অভয়ের বাসার থেকে বের হল, তখন সে পাঁঠার মত ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

ছাত্রদল সতীর কোয়ার্টারে এসে তাকে বলে—দিদি, আপনার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করতে হবে। এই দেখুন অভয়বাবুর পদত্যাগ পত্র এনেছি।

উনি মনে করেছেন শহরের বুকে বসে পরমানন্দে যথেচ্ছাচরণ করে বেড়াবেন এবং সহরবাসী তা অনাদি অনন্তকাল অবধি মুখ বুজে সহ্য করবে। তা আর হবে না। সহরের বৃদ্ধ ও প্রবীণ দল নির্লিপ্ত থেকে দেশকে উচ্ছন্নের পথে ঠেলে দিলেও আমরা তা সহ্য করতে পারি না বা সহ্য করব না।

সতী তাদের প্রশ্ন করল—আমার পদত্যাগ পত্রের খবর তো কাউকে আমি জানাইনি, তোমরা কি করে জানলে?

ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারী হেসে বল্ল—আমরা সব খবর রাখি। আমাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কেউ যেতে পারবে না। আপনি যেদিন যে মুহূর্ত্তে পদত্যাগ পত্র দিয়ে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে।

সতী উত্তর দিল—তোমরা ছাত্র। এসব ব্যাপারের মধ্যে তোমাদের না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তোমাদের যাঁরা অভিভাবক তাঁরাই এসব বুঝবেন ভাল।

তোমরা এখন মন দিয়ে লেখাপড়া করে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা কর। তারপর দেশের দশের কথা চিন্তা কর। এখন এসব ব্যাপারে তোমরা মাথা না ঘামালেই ভাল হয়।

ইউনিয়নের সেক্রেটারী বলে—তা কি করে হবে দিদি? আমাদের বোনদের লেখাপড়া এই ভাবে একটি লোকের জন্য বছরের পর বছর ব্যাহত হবে—আর আমরা চুপ করে থাকবো?

যাঁরা সহরের বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী গুণীজন তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে স্বার্থান্ধতা। তাঁরা মনে করেন এভাবে শহরের ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে নিজের সংসার নিয়ে ডুবে থাকলে আখেরে তাঁদের ভাল হবে।

তাঁরা ভাবেন এসব ব্যাপার নিয়ে অন্যে চিন্তা করুক আমরা নির্লিপ্ত থাকি। তবে কেউ আমাদের শক্রতাচারণ করবে না।

কেউ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে না। ফলে অন্যায়-কারীর স্পর্দ্ধা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। কিন্তু আমরা ছাত্র সমাজ আমাদের মধ্যে স্বার্থান্ধতা এখনও ঢুকেনি। তাই আমাদের বাবা, দাদারা যখন আমাদের বোনদের শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন, তখন আমরাই তা করবো।

সতী হেসে উত্তর দিল—এসব করতে গিয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ মাটি কর না।

তাছাড়া পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে অভয়বাবু পদত্যাগ পত্র

দিলেও আমার পক্ষে আর এখানে থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। এসব আমার পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর।

তোমরা এখন ছোট, এসব ব্যাপার ঠিক বুঝবে না। তবে এইটুকু জেনে যাও—আমি ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করেই এ কাজ করেছি।

কোন রকম সেন্টিমেন্টের বশবর্ত্তী হয়ে এ কাজ করিনি।

কোন জায়গা বা কাজ হতে আমার মন উঠে গেলে আমাকে দিয়ে কেউ কোন কাজ করাতে পারবে না। এই আমার স্বভাব। ছাত্রীদের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু এখানে আমাকে জোর করে ধরে রাখতে গেলে হয়ত ওদেরই ক্ষতি বেশী হবে।

কারণ যে উৎসাহ, উদ্যম, প্রেরণা নিয়ে আমি কাজে নেবে ছিলাম, তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আর তা ফিরিয়ে পাবো না।

ছাত্রদের অনুনয় বিনয়, ছাত্রীদের চোখের জল, প্রাক্তন সহকর্মী, প্রেসিডেন্ট, সহরবাসীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে সতী অভয়ের চক্রজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছিল।

বার বার প্রতিহত হয়েছে সতীর উৎসাহ, উদ্যম। বৈরিতার চাপে তার আদর্শের গড় ভেঙ্গে পড়েছে, তবু সে নিজেকে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারেনি।

পারেনি শিক্ষার নামে, শিক্ষার বেসাতী করতে, ব্যবসা করতে। আশৈশব শিক্ষার যে সুন্দর, নির্মল, পবিত্র পরিবেশের চিত্র তার মনের মণি কোঠায় জ্বলজ্বল করছিল, সে প্রভা কখনও নিষ্প্রভ হতে দেয়নি।

আবার ব্যর্থতার গ্লানি নিয়েই তাকে নেবে আসতে হল। সে অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেনি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতাকে অপবিত্র হতে দেয়নি।

৮

সতীর বান্ধবী রেখা সতীর সঙ্গে দেখা করতে এল। দুই বান্ধবীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর কালা-পাহাড়ের আক্রমণ বিষয়ে।

সতী রেখাকে বলল—আমার অভিজ্ঞতা তো শুন্‌লি। এবার তুই এখন বল দিকি তোর স্কুলের কি সব অভিজ্ঞতার কথা চিঠিতে লিখেছিলি।

—তা শোনাব বলেই আজ এসেছি। বাঁকুড়ার একটা স্কুল। স্কুলটা নতুন নয়। 'সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয়ের' নাম শোনেনি এমন কেউ নেই।

অর্দ্ধ শতাব্দীর নিশানা ছাড়িয়ে গিয়েছে এর বয়স। বাংলা দেশের এক প্রসিদ্ধ স্কুল। শুনেছি এই স্কুলের সুরু হতেই এই স্কুলের শিক্ষার নৈপুণ্যের জন্য ও নানা আদর্শের জন্য সর্বজন প্রিয় হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু সেইসব শিক্ষিকা আজ আর নেই। শিক্ষাদানই যাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। শিক্ষাব্রতকেই তাঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করেছিলেন।

যাক্, সে সব অতীত কাহিনী। পুরানো যা কিছু সবই ছিল নির্ভেজাল। আর আজ প্রায় সবই ভেজাল। তাই অতীত বর্ত্তমান তুলনা না করাই উচিত।

বর্ত্তমানে আমাদের স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা শোভা গুহ। মহিলা কুমারী। সেক্রেটারী ডাঃ বিজন চৌধুরী। বিজনবাবু প্রবীণ।

স্কুলে জয়েন করার পর শোভাদি বেশ ভালই ছিলেন কাজকর্মে,

ব্যবহারে। কিন্তু বিজনবাবু সেক্রেটারী হয়ে আসার পর শোভাদি যেন সম্পূর্ণ বদলে গেলেন।

স্কুলে কো-অপারেটিভ ষ্টল খোলা হল। শিক্ষিকাদের ও ছাত্রীদের সহযোগীতায়। এই কো-অপারেটিভ ষ্টলে ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় খাতা, কাগজ, কলম, পেন্‌সিল, হতে সুরু করে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের টিফিনের খাবারও বিক্রি হত।

কিন্তু সেই কো-অপারেটিভ ষ্টলের হিসাব পত্রের দায় দায়িত্ব দেওয়া হল একজন পরিচারিকার উপর। নামে মাত্র একজন শিক্ষিকাকে তত্ত্বাবধান করতে দেওয়া হল। কিন্তু এই সমবায় ষ্টলের দৈনিক আয়ের টাকা জমা হত শোভাদির কাছে।

রুমা একেবারেই বোকা মেয়ে। এই দৈনিক আয়ের টাকা যে সে শোভাদির কাছে জমা দিত, তার কোন রসিদ কখনও সে নেয়নি। শোভাদি ও সেক্রেটারীর নির্দ্দেশে অতি সরল বিশ্বাসে সে তা করে যাচ্ছিল।

সমবায়ের টাকা উচিত ছিল কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখা। কিন্তু কোন দিনই তা করা হয়নি। প্রায় ১০ বছর ধরে এই একই অবস্থা চলেছিল।

কর্তৃপক্ষের প্রকৃত স্বরূপ এতদিন আমাদের কাছে প্রকাশ পায়নি। তাই আমরাও রুমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিইনি। কিন্তু আমরা সব শিক্ষিকারাই জানতাম রুমার কাছে সমবায়ের একটি পয়সাও থাকতো না।

যে ঝিটি সমবায়ের চার্জ্জে ছিল—সে ছিল শোভাদির খাস ঝি। তখন আমাদের মনে এটাই ধারণা হয়েছিল মনোরমা বিশ্বাসী বলেই শোভাদি তাকে সমবায়ের চার্জ্জে বসিয়েছেন।

আস্তে আস্তে শোভাদির ব্যবহারে যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল।

রুক্ষতা, রূঢ়তা তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেতে লাগল। টীচারদের

ক্যাসুয়েল লিভ নেওয়া নিয়েও তিনি যথেষ্ট বাদানুবাদ সুরু করলেন। তাঁর শ্লেষোক্তি করাতের মত মনের পরতে পরতে দাগ কাটতে লাগলো।

বিশেষ করে বিবাহিতা শিক্ষিকাদের ছুটি নিতে দেখলেই তিনি কথার বিষের ছুরি চালাতেন। এমন ভাবে মুখে হাসি টেনে ঠাট্টার বর্মে কথাটি তিনি ছুড়তেন, যা নিয়ে বাদানুবাদও করা যেতো না বা নীরবে সেই জ্বালা সহ্য করাও কঠিন হতো।

এই ধরণের ব্যবহারও আমরা নীরবে সহ্য করতাম। কিন্তু তারপর দেখা দিল আর এক রকম ব্যাধি। উপযুক্ত গুণের টীচারদের নিয়োগ না করে, কম টাকায় পার্ট টাইমের শিক্ষক নিয়োগ করা সুরু হল।

এতে শোভাদির পক্ষে সুবিধা ছিল যে আমাদের দল ভারী হবার সম্ভাবনা নেই। এবং অস্থায়ী পার্ট টাইমের শিক্ষকেরা স্কুল পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

অনেক অস্থায়ী টীচারকে স্থায়ী না করে, বাজে অজুহাতে তার চাকরী নাকচ করে, তার জায়গায় পার্ট টাইম টীচার নিয়োগ করা হচ্ছে।

এতে আমরা যারা স্থায়ী টীচার, আমাদের কাজের চাপ অনেক বেড়ে গেল। টীচাররা অনুপস্থিত থাকলে, আমাদের তাদের ক্লাস নিতে হচ্ছিল।

ফলে আমাদের অদৃষ্টে কোন দিনই অফ পিরিয়ড বলে কিছু থাকত না। পরীক্ষার পরও এক একজনের ভাগে ১২।১৩ সেট্ খাতা পড়ে। কারণ পার্ট টাইম টীচাররা তো এত খাতা দেখবে না।

এইসব কারণে টীচার'স কাউন্সিলের সভায় আমরা আমাদের প্রতিনিধি তুজনকে পরবর্ত্তী জি, বি,' র মিটিং এ এসব ব্যাপার উত্থাপন করতে বল্লাম।

সহকারী প্রধানা শিক্ষিকা মিতাদি ছিলেন আমাদের একজন

প্রতিনিধি। তিনি টীচারদের স্বার্থ নিয়ে সব সময় জি, বি, র মিটিংএ আলোচনা করে থাকেন। এজন্য তিনি শোভাদির চক্ষুঃশূল।

আমাদের অন্যতম প্রতিনিধি হৈম কিন্তু প্রথমার্দ্ধে মিতাদির সঙ্গে সঙ্গে টীচারদের স্বার্থে বলত। কিন্তু শোভাদি যে কি করে তাকে হাত করল জানা গেল না।

স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক হওয়ায় বোর্ড হতে লাখ খানেকেরও বেশী টাকা এসেছিল স্কুল দালান ও স্কুলের নানা এ্যাপারেটাস্ কিনবার জন্য।

এত টাকার বিনিময়ে যে দালান দাঁড় করান হয়েছে তা চীনা মাটির বাসনের মতই ঠুন্‌কো। ভূমিকম্পের একটা হাল্কা ধাক্কাও বোধ হয় এই স্কুল দালান সহ্য করতে পারবে না।

আর মিতাদির থেকে শুনেছি এ্যাপারেটাসের প্রকৃত দামের সঙ্গে ভাউচারে লেখা দামের কোন মিল নেই। এ না করতে পারলে মার্জিন রাখা তো সম্ভব নয়।

দালান তৈরীর মোটা অংশের ভাগ যে সেক্রেটারী ও এইচ, এম এর মধ্যে বাটোয়ারা হয়েছে এ সম্বন্ধে কারুরোই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শুধু তাই নয়। একজন বহুবছরের অভিজ্ঞা এইচ, এম তুষারদি পদত্যাগ করে এই স্কুলে সহকারী শিক্ষিকার পদে নিযুক্ত হন্। কিন্তু তুষারদির যখন চাকরীতে স্থায়ী হবার সময় হল,—তখন শোভাদি আবার সেই পুরানো পদ্ধতি গ্রহণ করলেন।

মিথ্যে একটা অছিলায় তাঁর চাকরী নাকচ করে দিল। সব দিক দিয়েই তুষারদি শোভাদি অপেক্ষা যোগ্যতর। পরন্তু অসাধুতার সঙ্গে হাত মিলাতে পারেনি বলেই তুষারদির ১৭ বছরের পুরাণো চাকরী ছেড়ে আসতে হয়েছিল।

এইবার আমরা সবাই রুখে দাঁড়ালাম। গাধার মত মার খেয়ে

খেয়ে পিঠ শক্ত হয়ে গেলেও—আমরা এবার পিছিয়ে গেলাম না। মিতাদি এ ব্যাপার নিয়ে তোলপার করে তুল্লেন।

মিতাদি মেয়েটি যদিও স্পষ্টবাদী, কিন্তু সরল। কারো প্রতি কোন অন্যায় উনি সহ্য করতে পারতেন না। কার কোন বিপদের কথা শুনে উনি ঝাঁপিয়ে পড়েন।

শোভাদি মিতাদির ছাত্রী ও শিক্ষিকা মহলের জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু বাহ্যতঃ তিনি এ মনোভাব প্রকাশ করতেন না। শোভাদি অত্যন্ত ধূর্ত্ত।

তার গহন মনের গোপন পর্দ্দার অন্তরালের খবর মিতাদি কখনই জানতে পারেননি। তাই শোভাদির কাজের বিরুদ্ধাচারণ করলেও, শোভাদি যখন মিতাদিকে তাঁর নানা কাজে সহায়তা করতে ডাকতেন, মিতাদি হাসি মুখেই তাঁকে সাহায্য করতেন।

শোভাদির ভয় ছিল তুষারদিকে। কারণ তুষারদির দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার কষ্ঠি পাথরে শোভাদির সব ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। বিশেষ করে এই কারণেই তুষারদিকে সরিয়ে দেবার জন্য শোভাদি ব্যগ্র।

তুষারদিকে নিয়ে যখন শিক্ষিকাদের সঙ্গে শোভাদির খুব মন কষাকষি চলছিল, তখন একদিন শোভাদির দেওয়া কি খাবার টিফিনের সময় মিতাদি গেলেন।

মিতাদি বরাবর শোভাদির সঙ্গে একই ঘরে বসে টিফিন খেতেন। আমরা টীচাররা তাঁকে কত বারণ করেছি, শোভাদিকে বিশ্বাস করে তার খাবার না খেতে।

কিন্তু মিতাদি কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বলেন—তোরা বৃথাই আমার জন্য চিন্তা করছিস্। আফটার অল শোভাদির সঙ্গে আমি ১০ বছর কাজ করছি।

শোভাদির অপকার কখনও আমি করিনি। তবে কেন তিনি আমার ক্ষতি করবেন?

তাঁর পলিসির সঙ্গে আমার পলিসি মিলছে না বলে তার প্রতিবাদ করছি। কিন্তু এর জন্য তিনি আমার ক্ষতি কেন করবেন ?

মিতাদিকে আমরা হাজার বার বলেও বিশ্বাস করাতে পারিনি যে মানুষের মধ্যেই বাস করে শয়তান। সুতরাং সতর্ক হওয়ায় দোষের কিছু নেই।

কিন্তু তিনি বরাবরই হেসেই আমাদের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। অবশেষে আমাদের অনুমান একদিন যথার্থই সত্যে পরিণত হল। একদিন শোভাদির দেওয়া খাবার খেয়ে মিতাদির ফুডপয়জন হল।

তবু মিতাদির শুভ্র মনের শ্লেটে আমাদের সাবধানী বাণী এতটুকু রেখাপাত করতে পারেনি। তিনি হেসে বললেন—আমাদের নিজেদের বাসার তৈরী খাবার খেয়েও তো কখনও কখনও এমন হয়ে যায় এতে শোভাদির কি দোষ ?

সে যাত্রায় মিতাদি রক্ষা পেলেন, কিন্তু পরের বারে হঠাৎ দেখা গেল ভাল মানুষ মিতাদির মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। এর জন্যও আমরা দায়ী করলাম শোভাদিকে।

মিতাদিকে ছুটি নিতে হল চিকিৎসার জন্য। এই অবসরে শোভাদি মিতাদির ড্রয়ার হতে শোভাদির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সব সরিয়ে ফেল্লেন।

ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে শোভাদি ও সেক্রেটারীর সঙ্গে আরও অনেক ব্যাপার হয়েছিল, যার জন্য আমরা সব শিক্ষিকারা শোভাদির পদত্যাগ দাবী করে বোর্ডের কাছে চিঠি দিলাম।

শোভাদির খাস্ ঝির দ্বারা শিক্ষিকাদের অপমান করানো। স্থায়ী টিচারদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে টাকা জমা না রাখা। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও টিচারদের ইনক্রীমেণ্টের টাকা না দেওয়া—এই ধরণের বহু অভিযোগ সমেত আমাদের যৌথ দাবীর পত্র জি, বি,র মেম্বার ও বোর্ডে পাঠান হল।

আমরা পিকেটিং সুরু করলাম। ছাত্রীরাও স্কুলে আসা বন্ধ করল। শোভাদির পদত্যাগ পত্র তারা দাবী করল। শোভাদির যথেচ্ছার রথ দিগ্ভ্রান্ত হয়ে যতই ছুটে চলেছে, আমরাও ততই রাশ টেনে ধরবার চেষ্টা করছিলাম।

আমাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ক্রমেই রূঢ় হতে রূঢ়তর হয়ে পড়ছিল। উনি যেন ক্ষ্যাপা কুকুরের মতই যাকে পারছেন তাকেই কাটছিলেন তাঁর রূঢ় ভাষায়।

স্কুলের অচল অবস্থা। এদিকে মিতাদিও চিকিৎসার জোবে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। অভিভাবকরা একটা সভা করে, অবিলম্বে স্কুলের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দূর করে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনবার জন্য শিক্ষিকাদের কাছে ও এম, সি,র মেম্বারদের কাছে আবেদন জানালেন।

আমাদের অভিযোগ ছিল সেক্রেটারীর বিরুদ্ধেও। তাই বোর্ড হতে এম, সি, ভেঙ্গে দিয়ে একজন এড্মিনিষ্টেটার নিযুক্ত করা হল। শোভাদিকে স্কুলে ঘেরাও করা হবে—এই গুজবে তিনি ভয় পেয়ে স্কুলে আসা বন্ধ করে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু এতেও তিনি নিষ্কৃতি পেলেন না। হঠাৎ একদিন ছাত্রীরা অতর্কিতে তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে তাঁর থেকে জোর করে পদত্যাগ পত্র আদায় করলো।

সেক্রেটারীকে দিয়েও তারা একই পদ্ধতিতে পদত্যাগ পত্র লিখিয়ে নিল। বোর্ড হতে পরিস্থিতির সম্যক্ অবগতির জন্য স্কুল পরিদর্শিকাকে পাঠান হলো।

শোনা যায় তিনি ওদেরই পক্ষে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সুবিধা কিছুই হয়নি। শোভাদিকে আমরা জয়েন করতে দেইনি।

শোভাদি ছুটি নেওয়ায় মিতাদিকে আমরা তাঁর পোষ্টে অফিসিয়েটিং করতে ডাকলাম। মিতাদি ফিরে আসায় স্কুলের

হাওয়াও যেন বদ্‌লে গেল। স্কুল আবার নিয়মিত চলতে লাগল।

কয়েকদিনের ধর্মঘটে ছাত্রীদের বিশেষ করে ফাইন্যাল পরীক্ষার্থিনীদের যে ক্ষতি হয়েছিল এক্‌স্‌ট্রা ক্লাস নিয়ে আমরা তা মেক্‌আপ্‌ করে দিয়েছিলাম। এতে ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা সকলেই আমাদের প্রতি তুষ্ট।

সতী বলল—ছাত্রীদেরও এভাবে শিক্ষিকাদের ঝগড়ার মধ্যে জড়িয়ে ফেলা—এ কিন্তু তোদের খুবই অন্যায় হয়েছে।

ন্যায় অন্যায়ের যুগ চলে গেছে। এ যুগে যেন তেন প্রকারেণ কাজ হাসিল করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

দেশের নেতারা যেখানে নিজেদের কার্য সিদ্ধির জন্য ছাত্র সমাজকে ডাক দেয়, আমরা ক্ষুদ্র শিক্ষিকা সমাজ তো সেই তুলনায় কিছুই নয়।

দেশের নেতাদের থেকেও আমাদের কর্ত্তব্য যে অনেক বড়। আমরাই তো দেশের নেতাদের আমাদের মানুষ গড়ার কারখানায় তৈরী করি।

আমরা তাদের সুষ্ঠু ভাবে শিক্ষা দিতে অক্ষম হয়েছি বলেই তো দেশের নেতৃ স্থানীয়দের মধ্যেও এত উশৃঙ্খলতার বান ডেকেছে।

এ তোরা কি সর্বনাশী নীতি গ্রহণ করেছিস্‌, রেখা? এ কি তোরা বুঝতে পারছিস্‌ না, এভাবে তোরা ছাত্রীদের মনে শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে যে উচ্চ আদর্শ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ছিল, তা বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যেতে সাহায্য করছিস্‌।

হয়ত তোর কথা সত্যি, সতী। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গেলে ওদের সমবেত সহায়তা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই নতুবা আমাদের মুষ্টিমেয় শিক্ষিকাদের আর্তরব ওপরওলার কানে প্রবেশ করবে না।

কিন্তু ছাত্রীদের শিক্ষিকাদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ দেখেই তুই ভড়কে

যাচ্ছিস্—এদের ভূমিকার কথা শুনলে না জানি কি করবি, এহো বাহ্য, ধীরে ধীরে ধৈর্য্য ধরে শ্রবণ কর।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল এক মারাত্মক ব্যাপার। মিতাদির সুস্থ হওয়াটা তারা কেউ-ই পছন্দ করেনি। কারণ মিতাদির অবর্ত্তমানে শোভাদি ও সেক্রেটারী স্কুলের টাকার হিসাব নিকাশ অনেক নষ্ট করা সত্ত্বেও মিতাদি নিজেই যে একজন জলন্ত সাক্ষ্য রয়ে'গেলেন।

মিতাদির একটু একটু জ্বর হয়েছিল। তাই উনি এবারও সবার নিষেধ অমান্য করেই ডাঃ বিজন চৌধুরীর থেকে অষুধ এনে খেলেন। কারণ ডাক্তার হিসাবে ডাঃ চৌধুরীর হাত যশ আছে। এবং মিতাদির ডাঃ চৌধুরীর চিকিৎসায় প্রগাঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু এই বিশ্বাসই তাঁর সব সর্বনাশের মূল হল। অষুধ খাওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই মিতাদি মারা গেলেন। অদ্ভূত বাড়ী মিতাদির।

মিতাদি মারা যাবার পরও ডেটত্ সার্টিফিকেটের জন্যও ডাকা হলো সেই একই ডাক্তারকে। শবদাহ হয়ে গেল। মিতাদির মৃত্যুর পর শোভাদিও ডাঃ চৌধুরীর এত তৎপরতা ও সহযোগীতা আমাদের মত দূর্জ্জনদের মনের পাতায় সন্দেহের দাগ কাটে।

মিতাদির মৃত্যু এত আকস্মিক যে আমরা সবাই শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কারণ মিতাদি বলেছিলেন আমার জীবন পণ করে আমি এই ঐতিহ্য মণ্ডিত স্কুলের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনবো। সব কলুষতা দূর করবো।

হয়ত উনি বেঁচে থাকলে তা সম্ভবও হত। কারণ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, স্পষ্টবাদিতা, সদাচারণের জন্য শোভাদি ও সেক্রেটারী তাঁকে ভয় ও সমীহ করে চলতেন।

ডাঃ চৌধুরীর মারফৎ মস্তিষ্ক বিকৃতির কিছু দাবাই হয়ত শোভাদি মিতাদিকে যে টিফিন খেতে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতার বড় বড় ডাক্তারদের দেখিয়ে যখন তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে আনা হল, তখন তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন

শত্রুকে একেবারে উচ্ছেদ করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই সুযোগ দিলেন মিতাদিরই স্বামী সঞ্জয়বাবু।

ভদ্রলোকের না হয় শোকে তাপে মাথা ঠিক ছিল না। কিন্তু তোরা কেউ কেন থানায় একটা ডায়েরী দিয়ে, শবদেহটা পোষ্ট মর্টম্ করলিনে ?

মিতাদি চলে যাওয়া মানে আমাদের আন্দোলনের স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়া। তাই আমাদের মাথাতেও তখন কারো এই বুদ্ধিটা খেলেনি।

কিন্তু মিতাদির শেষকৃত্য হয়ে যাওয়ার পরই আমাদের সবার মনে এক সাথেই যেন এই প্রশ্ন জেগেছে। কিন্তু প্রতিকারের পথ তখন আর ছিল না।

মিতাদি চলে যাবার পর হতে আমাদের মনোবলও অনেকটা ভাঙ্গতে সুরু করলো। কারণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কে নেবে ? মিতাদির মত সব দিকে যোগ্যতা সম্পন্ন এমন মেয়ে আর দ্বিতীয় নেই।

আর যারা তারা সবাই দোষে গুণে মিলিয়ে। তাই কাকে বেছে কাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হবে এই চিন্তায় ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে গেল।

জানিস তো মেয়েদের মন ঈর্ষ্যাপরায়ণ। সুতরাং কেউ কারো থেকে নিজেকে ছোট মনে করে না। ফলে বেশ কিছুদিন আন্দোলনে ভাটা পড়ে গেল। এই সুযোগ গ্রহণ করতে শোভাদি তৎপর হল। টাকা দিয়ে জনা দুই শিক্ষিকাকেও তাঁর দলে ভাগালেন সহ প্রধানা শিক্ষিকার পদ দেবার লোভে।

এই দুইজন শিক্ষিকা আমাদের সভায় উপস্থিত থেকে সব খবরাখবর রোজ শোভাদির বাসায় গিয়ে গোপনে তাঁর কাছে রিপোর্ট করে আসে।

তোদের মধ্যেও তবে মীরজাফরের দল আছে !

মীরজাফরের দল কোথায় নেই এ যুগে ? এরাই তো দেশটা রসাতলে টেনে নিচ্ছে। শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে দেশকে।

চিহ্নিত হয়ে গেল মায়া ও মালিকা। ধিক্কারের স্রোতে এদের ডুবিয়ে দেওয়া হল। তবু এরা নির্বিকার। এমনিই বোধ হয়—হয়। গুপ্তচরের চরিত্র চোরের মত। মার খেয়ে মার হজম করে থাকে। তাই আমাদের শত ধিক্কারেও তারা শোধরালো না।

পরন্তু তাদের মারফৎ শোভাদি কিছু সংখ্যক মেয়েকেও হাত করল। ঘন ঘন শোভাদি ও ডাঃ চৌধুরী ডি, আই অফিস ও বোর্ড অফিসে ছুটো-ছুটি করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল শোভাদি তাঁর ছুটির নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের আগেই চাকরীতে জয়েন করছেন। আমরা স্থির করলাম আবার আমরা ধর্মঘট করব, এবং বোর্ডের থেকে নির্দ্দেশ না আসলে সিনিয়ার মোষ্ট টিচার ফুলরেণুদি চার্জ্জ বুঝিয়ে দেবেন না।

ছাত্রীরা শোভাদিকে ঢুকতে দেবে না স্থির করে পিকেটিং করবার ব্যবস্থা করল। কিন্তু দেখা গেল মায়া ও মালিকার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম সবই ভেস্তে গেছে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই শোভাদি মায়া ও মালিকা পরিবেষ্টিত হয়ে স্কুলে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর দেহ রক্ষী স্বরূপ মায়া, মালিকার রিক্রুটেড্ ছাত্রীরাও ঘুম থেকে উঠেই রণং দেহি ভাব নিয়ে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

ফুলরেণুদি অফিস রুমের চাবি আগের দিনই নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই দারোয়ান ঐ ঘর তাঁকে খুলে দিতে পারেনি। তিনি আমাদের ষ্টাফ রুমে গিয়ে বসেছেন।

আমরা দলবদ্ধ হয়ে ছাত্রী ও শিক্ষিকারা ঢুকলাম স্কুলে। আমরা কোন শিক্ষিকাই সেদিন হাজিরা খাতায় সই করবো না স্থির করেছিলাম।

ইতিমধ্যেই শোভাদি পথের কাঁটা মিতাদিকে সরিয়ে অনেকটা পথ পরিষ্কার করে ফেলেছেন। সাকরেদ জুটিয়েছেন সমাজবিরোধী কিছু লোক—যাদের নাম পুলিশের খাতায় আছে।

স্কুলে ঢুকেই ছাত্রীদের দুই দলের মুখে বিরুদ্ধমুখী শ্লোগান ধ্বনিত হতে শোনা গেল।

শোভাদি ফুলরেণুদিকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিতে বললেন। ফুলরেণুদি জানালেন বোর্ড হতে স্কুলে শোভাদির আর্লি জয়নিং এর কোন চিঠি আসেনি। বা চার্জ বুঝিয়ে দেবার নির্দেশেও চিঠি আসেনি।

শোভাদি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে বোর্ডের অনুমতি নিয়ে তিনি জয়েন করছেন, সুতরাং তাঁকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিতে ফুলরেণুদি বাধ্য। উভয়ের মধ্যে যখন বচসা সুরু হয়েছে, তখন শোভাদির পক্ষের কিছু সংখ্যক মেয়ে ফুলরেণুদিকে ধাক্কা দেয় ও শ্লোগান তুলে—ফুলরেণু ভৌমিক মুর্দ্দাবাদ। শোভা গুহ জিন্দাবাদ।

ফুলরেণুদি ছাত্রীদের থেকে অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন,—কিন্তু কয়েকজন শিক্ষিকা ও ছাত্রী গিয়ে দ্রুত তাঁকে ধরে ফেলে।

এবার এই পক্ষের ছাত্রীদের মধ্যেও দেখা গেল রণং দেহি ভাব। তারা শ্লোগান দিল—সাবিত্রী স্কুলের তহবিল কে তছরূপ করেছে? আর কে? শোভা গুহ। মিতাদিকে খুন করেছে কে? শোভা গুহ ও বিজন চৌধুরী।

পাল্টা শ্লোগান এল সমবায় ষ্টলের টাকা লুটেছে কে? আর কে—রুমা আইচ।

কেবল শ্লোগানের মাধ্যমেই দুই দলের রণ দামামার সমাপ্তি ঘটল না। এবার সুরু হল উভয় পক্ষের ছাত্রীদের মধ্যে প্রথমে চুলোচুলি। শোভাদির পক্ষে মুষ্টিমেয় ছাত্রী অর্থাৎ আমাদের পক্ষে ৭২৫ জন এবং শোভাদির পক্ষে মাত্র ২৫ জন ছাত্রীর মধ্যে সংগ্রাম সুরু হল।

সতী, তুই শুনে অবাক্ হবি—কি অদ্ভুত রণসাজে শোভাদির দলভুক্ত মেয়েরা সেজে এসেছিল। প্রত্যেকে রুমালের মধ্যে অনেক গুলো আলপিন গেঁথে এনেছিল এবং রুমালটা এমন কৌশলে ধরে

ছিল যে নিজে অক্ষত থেকে প্রতিপক্ষকে ঐ আলপিনের আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত করা খুবই সোজা।

তাদের আর একটা রণ কৌশল হলো ব্লেডের একাংশ কৌশলে ঢেকে তা রুমাল দিয়ে ধরে—যাতে তীক্ষ্ণ ব্লেডের আঘাতে নিজেদের হাত না কাটে, প্রতিপক্ষের হাতে মুখে এমন ভাবে ব্লেড্ চালিয়ে দিয়েছে যে আমাদের পক্ষের মেয়েদের সর্বাঙ্গে রক্তের গঙ্গা বয়ে গেছে।

তাছাড়া ইট্ পাটকেল ছোড়া, শাড়ী ব্লাউস টেনে ছিঁড়ে টুক্রা টুক্রা করে দেওয়া, মুঠি বদ্ধ চুল ছিঁড়ে ঘরময় করেছে।

আমাদের পক্ষে মেয়েরা কল্পনাও করতে পারেনি যে প্রতিপক্ষের স্বল্প কয়টি মেয়ে আলপিন্, ব্লেড নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। তবু সংখ্যায় আমাদের ছাত্রীরা বেশী থাকায় প্রতিপক্ষের কাছে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তারা কাবু হয়ে পড়েছিল অল্পেই।

ষ্টাফ রুমে যখন ছাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে, তখন শোভাদির পক্ষ নিয়ে কয়েকজন সমাজ বিরোধী মস্তান স্কুল কম্পাউণ্ডে ঢুকে কয়েকটি মেয়েকে এমন ভাবে আঘাত করে যে, সেই সব মেয়েরা গুরুতরভাবে আহত হয়। আমরা শিক্ষিকারা গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে না আনলে বোধ হয় মেয়ে কয়েকটিকে ঐ মস্তানরা খতম করেই দিত।

ফুলরেণুদি থানায় ফোন করলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু পুলিশ এসে পৌঁছাল ঘণ্টা ২।৩ পর, যখন মস্তানরা শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে অকারণে ছাত্রীদের নিগৃহীত করে বিজয়গৌরবে ফিরে গেছে।

শুধু তাই নয়। থানায় যিনি তদারক করতে এসেছিলেন, তিনি সাক্ষী ডাকলেন ঐ মস্তানদের বাড়ীর লোককেই।

আমরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম তার কাণ্ড দেখে, যে দোষী সে-ই হবে সাক্ষী। অতএব সুবিচারের সম্ভাবনা কতদূর আন্দাজ করা মোটেই কষ্টকর নয়।

ফুলরেণুদি থানার বিরুদ্ধে মস্ত এক রিপোর্ট লিখে এস, ডি, পি,

ও, থানার অফিসার ইন-চার্জ ও বোর্ড অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। থানার থেকে আমাদের স্কুল মাত্র দশ কদম।

৭৫০ জন ছাত্রীর চীৎকারে যেখানে সমস্ত শহরের লোক ছুটে এসেছে, সেইখানে ঘন ঘন কয়েকবার ফোন করার পরও থানার থেকে এন্‌কোয়ারী করতে লোক এল ৩ ঘণ্টা পর। তাও আবার অপরাধীর বাসার থেকেই তদন্তের সাক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে।

ছাত্রীদের নিয়ে এভাবে রণযুদ্ধ করা শোভাদির পক্ষে যতটা না অন্যায় হয়েছে, ততোধিক অন্যায় হয়েছে ঐ মস্তানদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়া এবং তারা তাঁর ছাত্রীদের আহত করে নির্বিঘ্নে পলায়ন করার মধ্যে তিনি কোন রকম প্রতিবাদ জানাননি। এসব ব্যাপার হতে বোঝা যায় যে—এই মস্তানরা তাঁরই অর্থপুষ্ট।

দেখ্‌লি তো রেখা। ছাত্রীদের শিক্ষিকাদের কোঁন্দলের মধ্যে টেনে এনে তোরা কি অন্যায় করেছিস্। এখন ছাত্রীরা শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের শ্লোগান দিচ্ছে।

ছিঃ, ছিঃ, তোরা এদের শিক্ষার নামে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিস্ তা কি বুঝতে পারছিস্ না।

তুই ভুল করছিস্ সতী। আজকালকার ছাত্রীরাও আমাদের যুগের ছাত্রীদের মত শান্ত শিষ্ট নয়। তারা আমাদের চেয়ে লেখা পড়ায় যদিও অনেক পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু দেশের রাজনীতি, স্কুলের রাজনীতি পরিবারের রাজনীতিতে তারা এতই পরিপক্ক যে আমরাত এই বয়সে এতটা বুঝতাম না।

কারণ, আমাদের যুগে আমাদের সমস্ত মনোযোগ ছিল পাঠ্য পুস্তকে। কিন্তু এখন এদের কাছে লেখাপড়াটা হল সেকেণ্ডারী, রাজনীতিই মুখ্য। তাই যে ধরণের রাজনীতিই হোক্ না কেন— তাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সুতরাং স্কুলের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার তারা নিজেরাই নানা

সূত্র হতে জেনে নিয়েছে। আমাদের আর তাদের কাছে কিছু পরিবেশন করার প্রয়োজন হয়নি।

যাক, এবার শোন্। আমাদের স্কুলের রাজনীতি এখন সমগ্র সহরের রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ছেলেদের স্কুল ও কলেজের ছাত্ররাও আমাদের স্বপক্ষে ধর্মঘট চালাচ্ছে।

যে সমাজবিরোধীরা স্কুল প্রাঙ্গনে ঢুকে তাদের বোনদের লাঞ্ছিত করেছে, তাদের শাস্তির দাবী, যে অফিসার তিন ঘণ্টা বিলম্বে মেয়েদের স্কুলের গোলযোগের এনকোয়ারী করতে গেছে তাকে সহ থানা অফিসার ইন-চার্জের বদলী ও শাস্তি, সেক্রেটারী ও প্রধানা শিক্ষিকার পদত্যাগের দাবীতে এখন সারা সহর গরম।

দুই পক্ষই এখন সমানে নানা পোষ্টার যত্র তত্র ছড়িয়ে নিজেদের ঝাল মিটাবার চেষ্টা করছে, আবহাওয়া গরম দেখে কর্তৃপক্ষ স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে।

জানি না এর পরিণতি কোথায়? শিক্ষা কেন্দ্রের এই দূষিত আবহাওয়া কি করে দূর করা সম্ভব?

মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর দুষ্কর্মের জন্য দেশের পীঠস্থান শিক্ষা কেন্দ্র গুলি আজ কলুষিত। ছাত্র সমাজ আদর্শচ্যুত, শাসন বিমুক্ত হয়ে বল্‌গাহীন অশ্বের মত অর্থহীন ভাবে ছুটে চলেছে।

সতী দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলো—হায় হতোস্মি! এই কি শিক্ষালয়। যেখানে পিতামাতা অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের সন্তানদের জ্ঞানী, গুণী, মহৎ ও উচ্চ আদর্শে তৈরী করবার আশায় পাঠিয়ে থাকে।

আধুনিক শিক্ষক শিক্ষিকারা কি তাঁদের পবিত্র কর্ত্তব্য সম্পাদন বা গুরু দায়িত্ব পালন করে দেশের ও সমাজের কোন কল্যাণ সাধন করছে?

শিক্ষালয়ে ছাত্র ছাত্রীরা আসে অন্ধকার মনকে জ্ঞানের আলোকে

রঞ্জিত করবার জন্যে। মহান্ আদর্শে নিজেদের তৈরী করবার জন্যে, মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য।

কিন্তু সর্ব্বত্রই শোনা যায় হতাশার একটি সুর। কল্পনা বিলাসী সতী কল্পনায় যে আদর্শ সৌধ গড়েছিল, বাস্তবের নির্মম আঘাতে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দেশের সমাজের অন্য এক নগ্ন মূর্ত্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘট্‌ল।

৯

একদিন সতী তার বান্ধবী সুলেখার বাসায় বেড়াতে গেল। সতীকে দেখে সুলেখা বলে উঠলো – এই যে সতী তোর কথাই কয়দিন ধরে ভাবছিলাম। তোর কথাই বোধ হয় সত্য হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা বোধ হয় এ যুগে আর থাকবে না।

তোর অভিমতে আশ্চর্য্য হবার মত কিছু নেই। তবু জানতে ইচ্ছে করে ব্যাপারটি কি ?

সব স্কুলের মধ্যেই ঢুকেছে পাপ। এই যে আমাদের স্কুল, শেষ অবধি এইটিও বাদ গেল না।

কেন তোদের স্কুলে আবার কি হলো ? তোদের স্কুলের সবার মধ্যে তো বেশ একটা সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল শুনেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটলো—যাতে এমন কনক্লুশেন্ ড্র করতে হল ?

আজ সে গল্পই শোনাবো।

আমাদের স্কুলের হাসিরাশিদি প্রায়ই স্কুলের অনুপস্থিত থাকেন। স্কুল চালান যোগমায়াদি। অথচ এইচ, এম এর মোটা বেতনটা গ্রহণ করেন হাসিরাশিদি।

কিন্তু এতেও আমাদের কোন আপত্তি ছিল না, যদি নাকি উনি আমাদের স্বার্থে আঘাত না হানতেন।

এই যেমন অতিরিক্ত টিচার নেবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও—উনি তা নেবেন না, আমাদের দিয়ে এক্সট্রা ক্লাস করাবেন। পরীক্ষার সময় এক একজনকে ১০।১২ সেট্ করে খাতা দেখ্তে হচ্ছে।

শুধু তাই নয়। কোর্স শেষ না হওয়ার অজুহাতে স্কুলের পরও ছুটির দিনেও এক্সট্রা ক্লাস আমাদের দিয়ে করান।

কোন টিচার যদি ছুটিতে থাকেন, ছুটির মধ্যেও তার কাছে তার ভাগের পরীক্ষার খাতা পাঠিয়ে দেন্।

উনি নিজে কিন্তু প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন। একবার দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরেই চলে গেলেন। আমরা তখন সেক্রেটারী ও এম, সি, কে জানালাম যে অন্যায় ভাবে হাসিরাশিদি কি করে এত ছুটি ভোগ করেন। তাঁর প্রাপ্য কোন ছুটি তো নেই।

হাসিরাশিদি তখনও চাকরীতে স্থায়ী হন্‌নি। তাই এম, সি, র মিটিং এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল একটিং এইচ, এম অর্থাৎ বীণাদিকেই এইচ, এম করা হবে।

বীণাদির প্রধানা পদের জন্য প্রস্তুতি পর্ব যখন চলছে। তখন হাসিরাশিদির স্বদেশী সহকর্মী ছন্দা এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম দিয়ে হাসিরাশিদিকে আনালো—যার জন্য বীণাদির আর এইচ, এম হওয়া সম্ভব হ'ল না।

কিন্তু ছন্দার এই উপকারের প্রতিদান হাসিরাশিদি কি ভাবে দিল জানিস্? ছন্দা সংস্কৃতে এম, এ ও বি, টি। সে প্রাইভেট পড়ে ইংলিশে এম, এ দেবার জন্য তৈরী হয়েছিল।

হাসিরাশিদি কিছুতেই পরীক্ষার আগে তাকে ষ্টাডি লিভ দেবেন না। বোর্ডে গিয়ে বোর্ডের নিয়মানুসারে ছন্দা যখন পরীক্ষার কয়দিন ষ্টাডি লিভের জন্য দরখাস্ত করল, হাসিরাশিদি সেই আইন অমান্য করে ছন্দার ছুটিটা বিনে মাইনে করে দিলেন।

শুধু ছন্দা নয়—আমরা লক্ষ্য করেছি অন্য যে কোন কারণে ছুটি মঞ্জুর করতে উনি তেমন দ্বিধা করেন না। বিশেষ করে নিজে অত ছুটি নেন বলেই বোধ হয় ছুটি সম্বন্ধে উনি তেমন কড়াকড়ি করেন না।

কিন্তু কেউ কোয়ালিফিকেশন বাড়াবার জন্য পরীক্ষা দেবার জন্য বা পড়বার জন্য যদি ছুটি চায়—তখনই তাঁর ভিন্ন রূপ।

এটা কেন হয় জানিস্? ইন্‌ফিরিয়রিটির থেকেই তাঁর এই

অবস্থা হয়ে থাকে। হাসিরাশিদি ফিলোজফির থার্ড ক্লাশ এম, এ। তাই তাঁর বয়ঃ কনিষ্ঠ সহকর্মীরা যারা পূর্বেই একটাতে সেকেণ্ড ক্লাশ এম, এ, বি, টি—তাদের আর তিনি দ্বিতীয়বার এম, এ পরীক্ষায় বসতে দিতে নারাজ।

হাসিরাশিদির যুক্তি স্কুলটা ক্যারিয়ার মেকিং এর স্থান নয়। সুতরাং স্কুলের কাজের ক্ষতি করে কোন শিক্ষিকাকেই পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না।

ফলে এই হয়েছে আমাদের সহযোগীতা তিনি হারিয়েছেন। আমরা তার বিরুদ্ধে আঠার দফা নালিশ জানিয়ে ডি, আই, এর কাছে ও বোর্ডে দরখাস্ত পাঠিয়েছি।

নিজের সুনাম ও স্কুলের সুনামের জন্য আমাদের স্কুল ছুটির পরও ছুটির দিনে এসে ছাত্রীদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতে হয়। স্কুলের পরীক্ষার ফল যখন বোর্ডে ভাল হয়—তখন সেই কৃতিত্বের যশ তিনি একা উপভোগ করেন। কখনও কাউকে ভুলেও বলেন না যে এর পিছনে শিক্ষিকাদের পরিশ্রম ও অবদান কতটা।

তাই আমরাও নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত ক্লাশ নেওয়া বন্ধ করেছি। উনি আইন করে ষ্টাডি লিভ যে বন্ধ করে দিয়েছেন তার জন্য ডি, আই ও বোর্ডের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছি।

তাছাড়াও ছাত্রীদের অবস্থার কথা চিন্তা না করে প্রকাশকদের থেকে মোটা টাকা নিয়ে প্রতি বছর প্রতি ক্লাশে বই বদ্‌লে দিচ্ছেন।

সাবজেক্ট টিচারের পরামর্শ ছাড়াই তিনি বইপত্র ঠিক করেন ফলে যথার্থই ভাল বইগুলি পাঠ্য তালিকা ভুক্ত না হয়ে বাজে বই পাঠ্য তালিকা ভুক্ত হয়ে থাকে।

এই কারণে এইচ, এমের বিরুদ্ধে আমাদের মনে যে উষ্মা ছিল, তা ক্রমেই ফেঁপে বড় হতে চলেছে।

তোদের স্কুলও কি রেখাদের স্কুলের মত বন্ধ ?

না আমরা এখনও অতদূর এগোইনি,—তবে হাসিরাশিদি না শোধরালে হয়ত তাও হবে। এখনও আমাদের জোট উনি ভাঙ্গতে পারেননি।

আমাদের সব চেয়ে বেশী রাগের কারণ ছন্দার প্রতি তাঁর প্রত্যুপকারের নমুনার প্রমাণ।

১০

সতীর প্রতিবেশী প্রতাপ মৈত্র একদিন এল সতীর সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করতে ঠিক নয় প্রয়োজনে।

হঠাৎ প্রতাপবাবুকে দেখে সতী একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলল—কি খবর ? ভুল করে এসেছেন বোধ হয়। আপনি সেই স্কুলেই আছেন নাকি অন্য কোথাও প্রধানের পদ অধিকার করেছেন।

হঠাৎ এসেছি বটে। তবে ভুল করে নয়। জেনে শুনে দায়ে পড়ে। হ্যাঁ ঐ স্কুলেই এই অধম এখনও টিকে আছে।

এবার বোধ হয় গাধার শিকল ছিঁড়ল। প্রবাদ আছে কত বছর জানি শিক্ষকতা করলে গাধা বনতে হয়। আমিও তো তাই গাধা বনেই ছিলাম এতকাল।

এবার কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোংরামীর মধ্যে আর থাকতে চাই না। তাই এসেছি এবার অন্য পথে ঢুকবার মতলবে। আইনটা যখন পাশ করা আছে, এ লাইনে যখন বয়সের কোন বার নেই, ভাবছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঙ্কিল পরিবেশ হতে মুক্তি স্নান করে আইনের পথে পা বাড়াবো।

আপনার বাবা দাদার ঐ পথে অনেক বছরের অভিজ্ঞতা। তাই এসেছি তাঁদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পরামর্শ নেবো এ পথে পা বাড়াবার আগে।

কিন্তু আইনের পথই কি আর স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ? আইনের কূটজালে কত নিরাপরাধীকে বিব্রত করা হয়। আবার কত প্রকৃত অপরাধী বেমালুম নিষ্কৃতি পাচ্ছে।

নিজের মক্কেলদের রক্ষা করবার জন্য কৌশুলীদের মধ্যে যে আইনের লড়াই চলে—উপভোগের বস্তু হলেও কিন্তু সব সময় সমর্থন-যোগ্য নয়।

তা হয়ত নয়, তবু তাতে এত নীচতা, হীনতা, কদর্য্যতা নেই। পরন্তু বুদ্ধির লড়াই এর হার জিতে আনন্দ আছে।

আইনের শাণে বুদ্ধি প্রখর হয়। চিন্তা শক্তি বাড়ে। কতজনকে বিপদ হতে উদ্ধার করা যায়। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কলুষতার সঙ্গে আইনের পেশাকে আপনি কখনও তুলনা করতে পারেন না।

সতী হেসে প্রশ্ন করল—আইনের ডিগ্রী থাকা সত্বেও ঐ পেশায় না যেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্র পীঠ স্থানেই তো আস্তানা গেড়েছিলেন এই সুদীর্ঘ কাল। হঠাৎ তার প্রতি এমন বিরাগ জন্মালো কেন?

শুনুন তবে। ছোট বেলা হতে শিক্ষকতা জীবনের প্রতি আমার ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ।

আদর্শবান শিক্ষকদের দারিদ্র্য জর্জ্জরিত জীবনের মধ্যেও তাঁদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, একাগ্রতা দেখে সত্যি তাঁদের মহান্ জীবনকেই আমার জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করব—এই ছিল আবাল্যের সঙ্কল্প।

কিন্তু তখন শিক্ষকতার পারিশ্রমিক ছিল নগন্য। তাই দাদারা জোর করেই ভদ্র জীবন যাপনের পথের সন্ধান স্বরূপ আইনের কলেজে ঢুকিয়ে দিলেন।

মনে মনে জানতাম ও পথ কখনো মাড়াবো না। তাই সুযোগ বুঝে শিক্ষকতা জীবনে টপাটপ আরও গোটা দুই বিষয়ে এম, এ, ও বি, টি ডিগ্রীটা নিয়ে নিলাম।

বাড়ীতে দাদারা যতই রুষ্ট হচ্ছেন কাল গাউন চাপিয়ে, গলায় সাদা ব্যাণ্ড ঝুলিয়ে, ভ্রাতাচন্দ্র কেন হাইকোর্টের বারে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছে না, ততই আমি একটার পর একটা ডিগ্রী কুড়িয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘাঁটি শক্ত করে নিচ্ছিলাম।

অনেক আশা, অনেক জল্পনা কল্পনা নিয়েই এসেছিলাম। চোখে

আদর্শের গগেলস্ পড়ে, মনে উৎসাহ উদ্যমের বন্যা একনিষ্ঠতা ও কর্ম প্রেরণা নিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রের পবিত্র মন্দিরে ঢুকেছিলাম।

কিন্তু কি পেলাম? সবই যেন মরীচিকা। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আজ আর ক্লেদ মুক্ত নয়। সর্বত্রই নোংরামীর অপ্রতিহত বেসাতী।

রঙ্গমঞ্চের পট পরিবর্ত্তনের মত একের পর এক স্কুল ছেড়েছি। কিন্তু সব প্রতিষ্ঠানের ভেতরের চেহারা এক। বাইরের ঠাটের কিছু বিভিন্নতা থাকলেও ভেতরের চেহারায় সবই এক দেখা যাচ্ছে।

তাই দেশে দেশে স্কুল পরিক্রমা করে যে পূণ্য সঞ্চয় করেছি, সেই পূণ্য সলিল স্নাত হয়ে আজ ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চাই।

এখন ভাবছি দাদারা ভাগ্যিস অলটারনেটিভ্ একটা ডিগ্রী জোর করে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, আজ তাই সেটা ভাঙ্গিয়ে দু মুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের কথা ভাবছি।

—আপনি তো আমারই মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খুব তিক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি। কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন শুনি।

—শুনবেন? সে একটি মহাভারত। অত শোনবার আপনার ধৈর্য্য থাকবে না। না থাক্। কেবল বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধেই বলছি।

সহকারী শিক্ষকের পদে এই স্কুলে চাকরী নিয়েছিলাম। বাসার কাছেই অতি প্রাচীন স্কুল। এক কালে যথেষ্ট সুনাম ছিল এই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতনের।

তাই অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা বিষ ক্রিয়ায় মন যে বিষিয়ে ছিল, তা আবার নির্বিষ হয়ে উঠবে এই আশায়, পাওয়া মাত্রই তা গ্রহণ করলাম।

প্রথম দিকে মন্দ লাগত না। শিক্ষকদের মধ্যে ছিল সম্প্রীতি।

ছাত্ররাও শ্রদ্ধা করত আমাদের। পড়াশুনা, এক্সট্রা ক্যারিকুলার একটিভিটি সবই চলত।

কাজ কর্মে বেশ উৎসাহ পাচ্ছিলাম। আমাদের এইচ, এম ও ছিলেন ভালই। বিশেষ করে তাঁর অবসরের সময় হয়ে এসেছে। শেষের দিন কটি তিনি ভাল ভাবেই কাটিয়ে যেতে চান্। যাবার কালের শেষ স্মৃতিটুকু যেন মধুর হয়ে থাকে সবার মনের মণি কোঠায়। এমন সময় দূভার্গ্যবশতঃ আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী হঠাৎ মারা গেলেন।

নতুন যিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হলেন, তিনি যেন স্কুলের সমস্ত পরিবেশটাকেই এক অসাধারণ ঐন্দ্রজালিকের মত এই কয়েক দিনে সম্পূর্ণ বদলে দিলেন।

বিদায়ী এইচ, এম এর স্থলাভিষিক্ত হবার কথা হৈমবাবুর। কারণ তিনিই ছিলেন সহকারী এইচ, এম। তিনি সদাচারী, সত্যভাষী, সৎ চরিত্রের। এই সব দোষের (?) জন্যই তিনি বর্ত্তমান সেক্রেটারীর বিরাগ ভাজন হলেন।

তাই তাঁকে ডিঙ্গিয়ে সাধারণ বি, এ, বি, টি পাশ সেক্রেটারীর একজন যোগ্য সাকরেদকে ঐ পদে বসানো হল। যদিও আমাদের মত ডবল এম, এ, ট্রিবেল এম, এ, বহু অভাজন ঐ ধূর্ত্ত শিক্ষক রণদেবের অধীনে কাজ করছি।

—এটা কিন্তু আপনাদের অন্যায়। আপনারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন না কেন? আপনাদের টিচারস কাউন্সিল কেন এম, সি, র কাছে এর বিরুদ্ধে আবেদন জানালো না?

—আপনি আমি আমাদের সেক্রেটারী গুরুদাস বাবুর কাছে একেবারেই শিশু। এসব ঘটবার সম্ভাবনা আছে জেনেই উনি আগে ভাগে এম, সি, র সবাইকে হাত করে নিয়েছেন।

তাছাড়া এম, সি, তে যাঁরা আছেন, প্রায় সবাই রিটায়ার্ড লোক। বয়োবৃদ্ধ শুধু নয়, জরা বার্দ্ধক্য তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

এম, সি, র মিটিং ডাকা হল কি না হল সে দিকে তাঁদের কোন খেয়াল নেই। মিটিং ডাকলেও তাঁরা তাতে উপস্থিত থাকেন না।

তাই গুরুদাসবাবুর গুরুর কৃপায় পথ তাঁর সব দিক দিয়েই পরিষ্কার। হঠাৎ একদিন দেখা গেল আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের নাকি অবসরের সময় হয়েছে নোটিশ এলো।

একস্‌টেন্‌শন্‌ দিয়ে গুরুদাসবাবু নবীন ও নতুনের পথরোধ করবার পক্ষপাতী নন। সেই জন্য স্বাস্থ্য, মন সবই ভাল থাকা সত্ত্বেও কাউকেই আর একস্‌টেনশন্‌ দেওয়া হল না।

তারপর নিয়োগ পত্র দেওয়া হল বেছে বেছে এমন যুবকদের— চাকরী যাদের অপরিহার্য্য। তাদের দারিদ্র্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এক অভিনব কায়দায় তাদের চাকরী দেওয়া হলো।

অর্থাৎ তাদের কোন নিয়োগ পত্র দেওয়া হলো না। মৌখিক কথায় বা সর্ত্তে তাদের চাকরী দেওয়া হলো।

এতে সুবিধা অনেক। এসব শিক্ষকরা চাকরীর স্থায়িত্ব না থাকায় স্কুলের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। চোখের সামনে এইচ এম ও সেক্রেটারীর অন্যায়ের পাহাড় দেখা সত্ত্বেও, তাদের অন্ধ সাজতে হলো।

মনে মনে তারা আমাদের সমর্থন করলেও মুখ ফুটে একটি কথা বলতে পারে না।

আমরা যারা স্থায়ী শিক্ষকের ছাড়পত্র পেয়ে গেছি, আমাদের মধ্যেও অনেকে স্কুলের পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামান না। কারণ তাঁরা ঘোরতর সংসারী।

জানেন এসব কেউটে সাপের দৃষ্টির সামনে যদি একবার পড়ে যান, তবে চাকরীটা হয়ত তাঁদের কেউ মারতে পারবে না। কিন্তু নাজেহাল করতে কেউ ছাড়বে না। এবং এসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া মানে উপরী যে রোজগারটুকু করে সংসারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে, তা ব্যাহত হবে।

এজন্য স্কুলের সাতে পাঁচে তাঁরা থাকেন না। রুটিন মাফিক কাজ তারা করে যান দশটা পাঁচটা। ছাত্রদের কিসে হিত বা অহিত হচ্ছে তা নিয়ে এঁদের মাথা ব্যথা নেই।

আর স্কুলের ভাল মন্দ কিসে হচ্ছে—তা দেখবার ও তাদের প্রয়োজন নেই। স্কুলের আয়ের চেয়ে বাইরের টিউশনি ও টিউটোরিয়েল হোমের প্রতিই তাদের আকর্ষণ বেশী।

অস্থায়ী যে সব হতভাগ্য শিক্ষকরা আছেন—তাঁরা ভুল করেও এ পথে পা বাড়াবে না। কারণ যাদের মন জুড়ে রয়েছে অন্ন চিন্তা, তারা পেটে খিল দিয়ে স্কুল পলিটিক্সে যোগ দিতে পারে না।

আর কয়েকজন আছেন, যাঁরা আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। নীতি, আদর্শ এসব তাঁদের কাছে ভূয়ো। তাঁদের একমাত্র চেষ্টা কি করে উপরওয়ালাকে খুসী করে নিজের কিছু সুবিধা করে নেওয়া যায়। এই যেমন একটু দেরীতে স্কুলে আসা বা প্রয়োজনে একটু আগে চলে যাওয়া। বা অন্যান্যদের তুলনায় পরীক্ষার খাতা জমা দিতে বা ফেরৎ দিতে বা প্রশ্নপত্র তৈরী করতে দেরী করা।

এসব সুযোগ সুবিধার মূল্য কি স্কুলের রাজনীতির থেকে কম? তাই এঁদেরও আমাদের অন্যায় অভিযানের সমর্থক হিসাবে পাওয়া যায় না। এঁরা বলেন—কি দরকার ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরানো?

পীযুষ ছেলেটি অনার্স ও এম, এস, সি পাশ। পড়ায় খুবই ভাল। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা খুবই খারাপ। পীযূষের ক্লাসে হঠাৎ একদল ছাত্র নানা রকম ভাবে গোলমাল সুরু করল।

প্রথমে তারা কয়েকজন একসঙ্গে জুতো ঘষতে লাগল। তারপর মুখে বই আড়াল করে নানা ধরণের জন্তুর ডাক ছাড়তে লাগল।

অন্যান্য ছাত্ররা বিরক্ত হয়ে তাদের এ ধরণের আচরণের প্রতিবাদ করে। তারপর সুরু হয় দুই দলে সংঘর্ষ। পীযূষ বেচারী কোন রকমেই এ গোলমাল থামাতে পারেনি।

অবশ্য মাত্র ৬।৭ জন ছাত্রই ঐ ধরণের ব্যবহার করেছিল। অন্যান্য সকলেই পীযূষের পক্ষে ছিল। হঠাৎ দেখা গেল রণদেব হেড্‌মাষ্টার স্বয়ং ক্লাশ রুমে উপস্থিত।

রণদেববাবুকে ভাল ছাত্ররা সব ঘটনা জানিয়ে ঐ মুষ্টিমেয় দুষ্টু ছাত্রদের দেখিয়ে দিল। তবু তাদের কোন কথা না বলে এইচ, এম যাবার সময় পীযূষকে ক্লাসের পর দেখা করতে বলল।

পীযূষ এইচ, এম এর রুমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বরখাস্তের এক চিঠি দিল। তার অপরাধ সে ক্লাস কণ্ট্রোল করতে পারে না। অথচ দুষ্টু ছাত্রদের কাউকেই ডেকে রণদেববাবু শাসন করলেন না।

তাঁর মতে ছাত্ররা দুষ্টুমী করবে। কিন্তু পীযূষ কেন তাদের কণ্ট্রোল করতে পারবে না? এটাই তার শিক্ষকতার মস্ত ত্রুটি। বেচারী পীযূষ অনেক অনুনয় করেছিল—অন্ততঃ আর একটি বার তাকে চান্স দিতে। কিন্তু রণদেব অটল।

বিনাদোষে গুরুদণ্ড নিয়ে চোখের জল মুছে পীযূষকে বিদায় নিতে হল।

বিদায় নিল মানে? আগে নোটিশ না দিয়েই পত্রপাঠ বিদায় এ কোন আইনে?

এতক্ষণ শুনলেন কি? এরা যে নিয়োগ পত্র বিহীন শিক্ষক। মুখে মুখে যেমন এদের এপোয়েণ্টমেণ্ট হয়, তেমনি মুখে মুখেই জবাব দেওয়া হয়।

পরদিন পীযূষের পদে যে নব নিযুক্ত শিক্ষক আসলো, তার গুণাগুণ সাধারণ বি, এস, সি পাশ। কিন্তু তার প্রধান গুণ সে সেক্রেটারী গুরুদাসের ভাগ্নে গুরুকৃপা রাজবংশী।

সার্থক নাম তার। নতুবা পীযূষের মত এত কোয়ালিফাইড ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের বিনা অপরাধে কর্মচ্যুতি হল। আর গুরুকৃপা সাধারণ বি, এস, সি পাশ্‌ করে সেই পদে অধিষ্ঠিত হল। এটা গুরুর কৃপা তো বটেই।

আপনাদের স্কুল তো হায়ার সেকেণ্ডারী শুনেছিলাম। বোর্ডের রেগুলেশনে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে অনার্স বা এম, এ, এম, এস, সি ব্যতীত তো নতুন কোন এপোয়েণ্টমেণ্ট দেওয়ার নিয়ম নেই। তবে কি করে গুরুকৃপাকে আপনাদের স্কুলে নেওয়া হল ?

বোর্ডর নিয়ম যদি যথাযথ পালন করা হবে, তবে হৈমবাবুকে ডিঙ্গিয়ে রণদেবকেও ঐ গদিতে বসাবার কোন নজির নেই। কিন্তু নিয়ম থাকলেই কি আর সর্বত্র তা পালন করা হচ্ছে ?

অনিয়মের স্রোতেই তো নিয়মের ভেলা ভেসে গেছে। সুতরাং এসব প্রশ্ন অবান্তর নয় কি ?

শুনুন এর পরবর্ত্তী ঘটনা। গুরুর কৃপায় চাকরী পাওয়া গেলেও শিক্ষকতা কাজে আর গুরু কৃপা সম্ভব হয়নি গুরুকৃপার, তাই তুমুল গোলমাল সুরু হল। গুরুকৃপা আদৌই পড়াতে বা বোঝাতে পারে না।

এবার আগের সেই মুষ্টিমেয় ছাত্র কয়টি কিন্তু চুপ করে রইল। পরে জানা গিয়েছিল গুরুদাস ও রণদেবের প্ররোচনায় ঐ ছাত্ররা পীযূষকে নাজেহাল করেছিল।

পীযূষ অল্প দিনেই তার শিক্ষকতার গুণে ছাত্রদের প্রিয় হয়েছিল। সুতরাং বিনা অপরাধে পীযূষের উচ্ছেদের জন্য বিশেষ করে অষ্টম হ'তে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রেরা রণদেবের কাছে রণং দেহি মূর্তিতে আবির্ভূত হল।

যথার্থই গুরুকৃপার যা বিদ্যা জোর ৬ষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীর কিছুটা কাজ চালান যায়। কিন্তু বর্ত্তমান বোর্ডের যা সিলেবাস তাতে তৎ উর্দ্ধে গুরুকৃপার বিদ্যার দৌড় পৌঁছান সম্ভব নয়।

ছাত্ররা পীযূষকে ফিরিয়ে আনবার দাবীতে ধর্মঘট সুরু করল। আমরা শিক্ষকরা শিক্ষকের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে যা করতে পারিনি আমাদের ছাত্ররা তাই করবার জন্য সচেষ্ট হল।

প্রথম গুরুদাস ও রণদেব তাদের নানা ভাবে ধমক দিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করল।

কিন্তু এ যুগের ছাত্রদের দাবিয়ে রাখা অত সোজা নয়। তারা ভেতরের খবরাখবর সবই জানে দেখলাম। তাই এদের বেশী ঘাটাতে এরা সাহস করল না।

কি করে আপনারা বুঝতে পারলেন যে এরা সব কিছুই জানতো।

এই যেমন শ্লোগান দিচ্ছে—হৈমবাবুকে গদী ছাড়া করল কে? আবার কে—রণদেব। রণদেব কি পাশ? কি আর পাশ—শুধুই ডবল বিয়ে পাশ।

ডবল বি, এ পাশ মানে? উনি কি ফরইন্ কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরও বি, এ পাশ?

তা নয়। ভদ্রলোকের দুই বিয়ে। আজকালকার ছাত্রদের কথা বলবেন না। আমরা আমাদের কলিগদের সম্বন্ধে যা না জানি, ওরা তাও জানে। সবার হাঁড়ির খবর রাখে। শুনুন ওদের আরো শ্লোগান।

হৈম স্যার ডবল এম-এ বি-টি। তবু হৈম স্যারকে গদি ছাড়তে হল কেন?—গুরুদাস ও রণদেবের মণি কাঞ্চন যোগ সাধনের জন্য। পীযূষ স্যারের চাকরী কেন গেল?

আর কেন? গুরুদাসের গুণনিধি গুরুকৃপার জন্যে।

গুরুকৃপা কে?

আবার কে? গুরুদাসের ভাগ্নে।

এই ধরণের অনেক শ্লোগান সুরু হল। শুধু তাই নয়, ছেলেরা ধর্মঘট করবে বলে শাসালো। রণদেবকে ঘেরাও করে রাখল।

অবস্থা সুবিধার নয় দেখে পীযূষকে আবার ডেকে পাঠান হল। এবারও লোক মারফৎ মৌখিক চাকরীতে নিয়োগ করা হল।

কিন্তু তার আগেই সেই মুষ্টিমেয় বখাটে কয়টি ছেলেকে দিয়ে এমন ব্যবস্থা করান হয়েছিল যে এবার নিজের জীবন রক্ষার্থেই পীযূষ নিজেই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

পীযূষকে আক্রমণ করবার জন্য বোমা ফেলা হল তার চলার পথে। অল্পের জন্য সে রক্ষা পেলো। কিন্তু কাদের নেপথ্য আক্রমণে এসব হচ্ছে তা সে বুঝতে পেরে স্কুলের চাকরী ছেড়ে দেয়।

এক ঢিলে দুই পাখী মারা হল। পীযূষকে গুরুদাস পুণরায় চাকরীতে বহাল করেছিল, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় চাকরী ছেড়ে চলে গেছে। সুতরাং ছাত্রদের আর অভিযোগ জানাবার কিছু নেই।

গুরুকৃপাও আবার চাকরীতে বহাল হ'ল। যদিও সে পড়াতে পারে না, তবু ক্লাসে রোজ যাওয়া আসা করে। ভাল ছাত্ররা পড়া বুঝাতে না পারায় বা তাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় নানা ভাবে নাজেহাল করে।

কিন্তু গুরুকৃপা যেন পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো। মাসান্তে টাকাটা গুছিয়ে নিতে পারাই হল তার মূখ্য উদ্দেশ্য।

অবশ্য গুরুকৃপাকে উপলক্ষ করে গুরুদাসের অনুগত কয়েকটি মুষ্টিমেয় ছাত্রর সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রদের রোজই স্কুলে মারামারি হচ্ছে। এবার কিন্তু ক্লাশ ম্যানেজ করতে না পারার অপরাধে গুরুকৃপার চাকরী যাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠ্ছে না।

দুই দলে বোমা ফাটাফাটিও চলছে রোজ। তবু গুরুকৃপাকে সরিয়ে কোন উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে না।

আরও শুনবেন? কত কাহিনীই যে শোনাতে পারি। শুনুন তবে।

সেদিন স্কুলে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক উভয়েই অনুপস্থিত। সেদিন আবার ছোটখাট কি একটা পূজা পার্বণ ছিল। সাধারণতঃ এই সব অকেশনে ছুটি দেওয়া হয় না। তবে ছাত্ররা ছুটি প্রার্থনা করলে, হাফ-হলি-ডে মঞ্জুর করা হয়ে থাকে।

প্রধান দুই কর্তা ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে আমার মত নেক্সট্ সিনিয়ার মোষ্ট অভাজনের উপর সেদিনের স্কুলের দায়িত্ব পড়লো।

পঞ্চম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সব ছাত্ররা একটা দরখাস্ত দিল যে ঐ ব্রত পার্বণ উপলক্ষে তারা ছুটি প্রার্থনা করছে।

ওদিকে নবম হতে একাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা সেদিন লেলিনের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে ছুটি প্রার্থনা করছে।

একই স্কুলে দুই কারণে দুই দল ছাত্র ছুটি প্রার্থনা করছে। এই অবস্থায় ছুটি মঞ্জুর করে যদি কোন নোটিশ আমাকে দিতে হয় তবে কোন্ উদ্দেশ্যটাকে মুখ্য করে দেখাবো. তা একটা চিন্তনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

যদি লেলিন জন্মোৎসব লিখি, তবে অধিকাংশ ছাত্র ক্ষুব্ধ হবে। আবার যদি সেই ব্রত পার্বণের উল্লেখ করি তবে সিনিয়ার মোষ্ট ক্লাশের ছাত্ররা হয়ত অপমান বোধ করবে।

কারণ আজকালকার ছাত্রদের মান অপমান তো আমাদের যুগের মাপকাঠি দিয়ে ঠিক করা যায় না। যাক, সহকারী অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই স্থির করলাম যে সেকেণ্ড পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটির ঘোষণা করা হবে, কিন্তু কোন্ উপলক্ষে তা উল্লেখ করা হবে না।

এ ভাবে দুই কূলই রক্ষা করা সম্ভব হবে। সেই রকম নোটিশ দেওয়া হল।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল। একাদশ শ্রেণী কক্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছাত্র মিলে লেলিন জন্মোৎসবে কি যে করল আমরা কিছুই জানি না। কারণ কোন শিক্ষককে সেই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্ব করতে বা কিছু বলবার জন্যে ছাত্রপক্ষ হতে কোন আমন্ত্রণ জানায়নি।

কিন্তু একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি যেন আমরা শুনছিলাম। একটা ক্ষুব্ধ বিক্ষোভের আভাস যেন আমাদের ষ্টাফ রুম পর্যন্ত ভেসে আসছিল। অন্যান্য ছাত্ররা ছুটির নোটিশ পেয়ে যে যার মত স্কুল দালান ও প্রাঙ্গন খালি করে চলে গেলেও আমরা শিক্ষক কয়জন বসে গল্প গুজব করছিলাম। তাই একাদশ শ্রেণীর কক্ষের উষ্মার

আভাস কিছু কিছু বাতাসে ভেসে আসছিল। কিন্তু ছুটি পেয়েও তাদের উষ্মার কি কারণ থাকতে পারে, ঠিক আমাদের পক্ষে বোধগম্য হচ্ছিল না।

পরের দিন যথা নিয়মে ঘণ্টা পড়েছে ক্লাশ সুরু হয়েছে। দেখা গেল প্রধান শিক্ষকের ,ঘরে একাদশ শ্রেণীর কিছু মস্তান এসে পূর্ব দিনের হাফ-ছুটির নোটিশে লেলিনের জন্মবার্ষিকীর উল্লেখ না থাকার হেতু ও কৈফিয়ৎ তলব করল।

প্রধান শিক্ষক এ বিষয়ে কিছু জানেন না, তাই অফিস রুমে প্রধান শিক্ষক আমাকে ডেকে পাঠালেন। ব্যাপারটা শুনে আমি হেড্ মাষ্টারকে বুঝিয়ে বল্লাম. দুই কারণে দুই দল ছাত্র ছুটি প্রার্থনা করেছিল, এই কারণেই সবার দাবী আমি মঞ্জুর করেছি উপলক্ষ উহ্য রেখে। আমার বিশ্বাস ছিল এতে উভয় দলই সন্তুষ্ট হবে।

একাদশ শ্রেণীর ছাত্র বিপ্লব রায় বল্লে—কি করে আমরা সন্তুষ্ট হব মনে করলেন, যেখানে আমাদের নেতার প্রতি আপনি অসম্মান দেখালেন।

তোমাদের অভিযোগ সত্য নয়। লেলিন কেবল তোমাদের নেতা নয়। তিনি বিশ্ববাসী সবারই শ্রদ্ধেয়।

তোমরা তো ছুটির দরখাস্তে নবম, দশম, একাদশ না লিখে—সমস্ত ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হতেই ছুটির জন্য আবেদন করতে পারতে। তবে তো আমার পক্ষেও উপলক্ষটা লেখা সহজ হতো।

কিন্তু তোমরা বিভেদ সৃষ্টি করলে মাত্র তিন শ্রেণীর নামোল্লেখ করে। যেখানে স্কুলের তিন চতুর্থাংশ ছাত্র একটি কারণে ছুটির জন্য আবেদন পত্র দিয়েছে—তাদের সেই উপলক্ষ্যকে নস্যাৎ করে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ছাত্রের ছুটির উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করা কি যুক্তি সঙ্গত হত ?

না স্যার আপনার যুক্তি সমর্থন যোগ্য নয়। মনে হয় আপনি

উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এই মহান্ নেতার প্রতি অসম্মান দেখাবার জন্যই এইভাবে নোটিশ দিয়েছেন।

আমি বুঝলাম তপ্ত লোহায় হাত দিতে গেলে হাতই কেবল আমার পুড়বে, ফল কিছু হবে না। তাই বিপ্লবের এই রূঢ় ভাষণের প্রত্যুত্তরে উচিত উত্তর না দিয়ে, তাকে ঠাণ্ডা করে বললাম।

বেশ তো তোমরা লেলিনের জন্মোৎসব আর একদিন বেশ সমারোহ ভাবে উদ্‌যাপিত কর। সমস্ত স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক সবাই আমরা তাতে অংশ নেবো।

কেবল উৎসব করলেই তো হবে না। লেলিন সম্বন্ধে আমরাও ২।৪ কথা সেই অনুষ্ঠানে তোমাদের শোনাতে পারবো। উদ্বুদ্ধ করতে পারবো তাঁর পদানুসরণ করবার জন্য।

তাছাড়া গতকাল হেড্ মাষ্টার, এসিটেণ্ট হেড্‌মাষ্টার ছিলেন না, আমাদেরও তোমরা ডাকনি। একটা দিন স্থির কর, সেদিন সবাই মিলে লেলিন জন্মোৎসব করব।

নির্দ্দিষ্ট একটি দিন ছাড়াই যে এই অনুষ্ঠান পালন করা যাবে না, তার তো কোন নিয়ম নেই। সুতরাং এ নিয়ে তোমরা মন খারাপ করো না। পরন্তু এই অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়, আমরা সবাই সেই চেষ্টাই করব।

—না, তা আর হয় না। যা একবার হয়ে গেছে, তা শেষ হয়ে গেছে। লেলিনের জন্মোৎসব নিয়ে আমরা ফার্স করতে রাজী নই, একই স্কুলে দুবার সেই অনুষ্ঠান পালন করে।

যাক্ এই বলে বিপ্লব রায় বিপ্লবী দলের নেতার মত উদ্ধত শিরে সদলে হেড্ মাষ্টারের ঘর হতে বের হয়ে গেল।

ভাবলাম ব্যাপার বোধ হয় ওখানেই মিটে গেল। কিন্তু একাদশ শ্রেণীতে ক্লাশ নিতে গিয়ে দেখলাম আবহাওয়া প্রবল ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা রয়েছে আমাদের নেতা লেলিন—লাল

সেলাম। আমাদের প্রেসিডেন্ট মাও-সে-তুং—লাল সেলাম। আমাদের নেতাকে যে অসম্মান করেছে, তার বদ্‌লা নিতে হবে।

দিনকাল যা পড়েছে। তাই নিজের জান বাঁচাতে চোখে দেখেও অন্ধ সাজতে হয়। কানে শুনেও বধির সাজতে হয়।

তাই বোর্ডের লেখা যেন চোখে পড়েনি, তা ওভার লুক্ করে ক্লাশে পড়া স্থুরু করতেই পিছনের বেঞ্চ হতে নানা রকম শ্লেষোক্তি কানে আসতে লাগল। নানা রকম পশুর ডাক দিয়ে ক্লাশ ভণ্ডুল করবার ষড়যন্ত্র চলেছে।

এক কালে আমিও. ক্লাসে দুষ্টু ছেলে ছিলাম—তবে এদের মত এতটা অভদ্র ও অশিষ্ট ছিলাম না। তাই আমি জানি কি করে ক্লাস ম্যানেজ করতে হয়।

গুটি কয়েক ভাল ছাত্র আছে—যারা এসব রাজনৈতিক ধোঁয়ায় ধূমায়িত এখনও হয়নি, তাই আমি তাদের উদ্দেশ্যেই খুব ভাল করে পড়াতে স্থুরু করলাম।

দেখলাম অযুধ ঠিক ধরেছে। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। তাই ক্লাশের অধিকাংশ ছেলেই আমার প্রশ্নোত্তরের পয়েন্ট লিখে নিতে স্থুরু করেছে। আমিও চোখ কান বুজে কোন রকমে ঘণ্টা শেষ করে ক্লাস হতে বেরিয়ে আসলাম।

এখানেই ব্যাপারটা শেষ হল না। প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটির আগে আমাদের স্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে নাটক ইত্যাদি মঞ্চস্থ করা হয়ে থাকে। এবারও তার প্রস্তুতি চলছিল।

অন্যান্য ক্লাসের ছাত্ররা এসে জানালো বিপ্লব রায় নাকি শাসিয়ে বলেছে—কেমন করে রবীন্দ্র জয়ন্তী হয় এবার দেখে নেবো। বোমা দিয়ে ষ্টেজ উড়িয়ে দেবো। স্যারদের খুলি উড়িয়ে দেবো।

বিপ্লবের দলকে সব শিক্ষকই মনে মনে ভয় করে। কারণ স্কুলে বিপ্লব স্থষ্টি করতে এরা ওস্তাদ। বস্তুতঃ এরা স্থবিধাবাদী। প্রয়োজনে যখন যে দলের বা পার্টির পক্ষ নিলে একটা গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা

সৃষ্টি করে বিপ্লব সৃষ্টি করা যায়—তখন সে তার দলকে সেই দলেই টানে। অতি অল্পেই এদের কেনা যায়। এদের হাত করেই তো গুরুদাস ও রণদেব নিজের উদ্দেশ্য এ যাবৎ সিদ্ধ করে এসেছে।

এই দলকে দেখবেন কখনও কংগ্রেসের বুলেটিন আওড়াচ্ছে—কংগ্রেস পতাকার তলে, কখনও সি, পি, এম এর লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছে, কখনও বা নক্সালপন্থী সেজে মাও-সে-তুং এর দোহাই দিয়ে উষ্মা প্রকাশ করছে।

যাক্ বিপ্লবের আল্‌টিমেটামে সকলেই গা বাঁচিয়ে চলতে ব্যস্ত। সকলেরই প্রাণের ভয়।

দুঃখের বিষয় আমিই আবার প্রতি বছর স্কুলের যত ড্রামা হয়ে থাকে তার ইন-চার্জে থাকি। এবারও তাই ঝক্কিই আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে।

বন্ধুরা সহকর্মীরা পরামর্শ দিল—কেটে পড়ো। নতুবা হয়ত বিপ্লব বোমা দিয়ে প্রাণটাই উড়িয়ে দেবে।

জানেনই তো আমি একটু গোঁয়ার প্রকৃতির লোক। আমার মেজাজ গেল রুখে। আমিও বদ্ধ পরিকর, যে করেই হোক নাটক মঞ্চস্থ করবই।

ভগবান সহায়। যেদিন নাটক মঞ্চস্থ হবার কথা, তার কয়েকদিন আগের থেকে গুরু দক্ষিণা দেবার জন্য মাল মশলা দিয়ে বোমা তৈরী করতে যেয়ে, বিপ্লবের ডান হাতটা গেল উড়ে। তাকে যেতে হলো হাসপাতালে। এবং তার দক্ষিণ হস্ত যারা—তাদের কারো কারো খোঁজে পুলিশ হতে এন্‌কোয়ারির জন্য স্কুলে এসেছিল।

ফলে যাদুধনরা একেবারে কাবু হয়ে সুশীল সুবোধ বালক সাজলো সাময়িক কালের জন্য। বিপ্লব স্কুলে বিপ্লব সৃষ্টি করতে যেয়ে নিজের জীবনেই বিপ্লব আনলো। এবং স্যারদের খুলির পরিবর্তে তারই হাত উড়ে গেল।

শুধু তাই নয়। আজও আমরা আমাদের কোন শিক্ষক বা

অধ্যাপককে দেখলে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে চলি। আর আমাদের ছাত্ররা আমাদের সামনে সিগারেট ফুঁকে ইয়ার্কি দেয়। এদের আচরণ এতই ঔদ্ধত্যপূর্ণ যে স্কুলে যখন ঢুকি, মাথা নীচু করেই চলি। কারণ এদের তো শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যাবার মত। অগত্যা আমরাই মান বাঁচাবার জন্য তাদের সব রকম অশিষ্টাচারণকে না দেখার ভান করে নিজদের মান বাঁচিয়ে চলি।

হয়ত এরপরে আমেরিকার ছাত্রদের মত এরা ক্লাশে বসেই সিগারেট ফুঁকবে। আমেরিকার সবই তো আজ আমাদের যুব সম্প্রদায়ের কাছে আদর্শ স্থানীয়, অনুকরণীয়। তাই বলছি তাদের এই প্রথাটিও যদি আমাদের ছাত্রসমাজ গ্রহণ করে—তবে আশ্চর্য হব না।

এই তো স্কুলের অবস্থা। আমাদের এখন প্রাণ হাতে করে স্কুলে যেতে হয়। কখন কোন্ দলের বোমায় আমাদের পিতৃমাতৃদত্ত প্রাণটি যায়। বলুন, এর মধ্যে কি আর চাকরী করা যায়?

সতী সহাস্যে বলে—অভিজ্ঞতা আমার ও আমার বান্ধবীদের অনেক হয়েছে। কিন্তু আপনাদের স্কুল তো দেখছি অভিনব। এই স্কুলের পলিটিক্সেও বৈচিত্র্য আছে। অবশ্য ছেলেরা দুর্ধর্ষ তো হবেই। মেয়েরাই আজকাল যা হচ্ছে!

প্রতাপ উত্তর দেয়—যা বলছেন। আজকাল যে সর্বত্র ষ্টুডেন্ট আন্‌রেষ্ট দেখা দিচ্ছে, এর জন্য আমি মনে করি শিক্ষকরাও কম দায়ী নয়।

শিক্ষক সমাজ এইসব উশৃঙ্খলতার অন্যতম কারণ বলতে পারেন।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে বিধ্বস্ত পারিবারিক অভিশাপের মধ্যে যে শিশু মনটি হোঁচট খেতে খেতে অনিশ্চিত কৈশোরের তটে এসে ধাক্কা খায়, তখন তারা মূল্যবোধহীন বর্তমানের মধ্যে হারিয়ে যায়।

সাংসারিক রাজনৈতিক সমস্যাগুলি এরই মধ্যে খুঁড়ে খুঁড়ে

তাদের অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে। শৈশব হতে পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক নানা সমস্যার ঘুর্ণিপাকে ঘুরে ঘুরে তাদের কোমল নরম মনের উপর একটা শক্ত কোটিন পড়তে সুরু করে।

সংসারে দেখে নানা সমস্যার জালে পরিবারের শান্তি ব্যাহত, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসার নীড় যে সংসার, নানা সমস্যার কঠোর আঘাতে তা ক্ষত বিক্ষত। হোম সুইট হোম—আজ আর নেই।

বাসা বলতে এইসব কিশোরদের অধিকাংশদের মনে জেগে উঠে ছোট্ট একখানা বা দুখানা আলো বাতাসহীন বদ্ধ ঘর। যে ঘরে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালাতে হয় অবশ্যি মনের হরষে নয়, দিনের অন্ধকার ঘুচাবার জন্যে। প্রতিবেশী বাড়ীর ধোঁয়ায় চোখের লবণাক্ত জলের স্রোত বুঝি রোধ করা যায় না।

তার মধ্যে ৮।১০ জন ছোট বড় মিলে প্রাণী বাস করে। অভাবের তাড়নায় যাদের মধ্যে অষ্টপ্রহর ঐ রুদ্ধ কক্ষে যেন কাকের ঝগড়া লেগে রয়েছে। সবার মুখ রুক্ষ, ভাষণ উগ্র, কণ্ঠস্বর তপ্ত। কেউ যেন কাউকে সহ্য করতে পারে না। এক জনের কথায় যেন অন্যের গায়ে ফোস্‌কা পড়ে।

শিশুদের বা কিশোরদের আব্দারের চাহিদা মেটাবার সঙ্গতি নেই সংসারের। কোন রকমে দুমুঠো যে তাদের মুখে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এটাই বেশী। এই তিক্ততার মধ্য দিয়েই এরা এগিয়ে চলেছে। সুইট হোম, মাই সুইট হোম, তারপরের লাইন মুখে আন্‌তে দুঃখে বুক ফেটে যায়।

প্রতিবেশী সমাজের অবস্থাও একই। পরস্পরের প্রতি নেই বন্ধু সহৃদয়তার সম্পর্ক। পরস্পর যেন হিংসা, ঈর্ষ্যার দৃষ্টি নিয়েই বাস করছে পাশাপাশি।

যুক্ত ভারতে দুই বিপরীত ধর্মের প্রতিবেশীর মধ্যে যে সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি ছিল—আজ তা সমধর্মীয় প্রতিবেশীর মধ্যেও অভাব। কেউ কাউকে ক্ষমাশীল চোখে দেখে না। পরন্তু একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার

মনোভাব। মৌখিক ভদ্রতার মুখোসের অন্তরালে প্রতিবেশীদের প্রকৃত চরিত্র ঢাকা পড়ে।

স্কুলের পরিবেশের কথা তো এতক্ষণ বল্লাম। শিক্ষকরা ছাত্রদের মাধ্যমে নিজেদের সার্থ সিদ্ধি করছে। ফলে শিক্ষকদের আদর্শ ছাত্রদের সামনে নেই। তারা আজ শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতেও ভুলে যাচ্ছে।

ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতির বন্ধন ছিল, তাও আজ ব্যাহত হচ্ছে রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

তাই কিশোর ছাত্ররা যখন কৈশোরের প্রান্তে এসে পৌছায়, তখন তাদের অস্থি মজ্জায় দেখা দেয় ঘুণধরা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভ।

সতী বল্ল—শুধু কি তাই? আজ কাল তাদের সামনে বহুমুখী সমস্যার ভিড় দেখা যায় যা আমাদের সময় আদৌ ছিল না।

প্রথমেই স্কুল কলেজে ভর্ত্তি হবার সমস্যা। অর্থাৎ সেখানেও কিউ দিতে হবে। ওয়েটিং লিষ্ট ছাড়াও ভর্ত্তি হওয়া যায়—যদি মোটা টাকা খরচ করতে পারেন। কোথাও ব্যক্তি বিশেষের পকেট ভরাতে হয়, কোথাও বা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু টাকা দান করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ জীবন বর্হিভূত পাঠ্য তালিকার বোঝায়, কিশোর কিশোরীরা ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। জীবন আদর্শের সঙ্গে সংহতি রেখে পাঠ্য তালিকা স্থির করা হয় না।

তৃতীয়তঃ শিক্ষাকেন্দ্রের নামে চলেছে এক ধরণের কালো ব্যবসা। রাম, শ্যাম, যদু, মধু যে পারছে, সেই কয়েকজন বেকার শিক্ষক শিক্ষিকাকে জুটিয়ে স্কুল খুলে বসেছে। যারা পরিশ্রম করে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করবার দায়িত্ব নিচ্ছে—তারা অর্দ্ধাহারে কাটাচ্ছেন।

কিন্তু বোর্ড ও ডি, আই অফিসের নাড়ি নক্ষত্রের খবর নিয়ে যারা শিক্ষার ব্যবসা খুলেছে,—তারা কিন্তু ফেঁপে ফুলে যাচ্ছে। উঠছে—তাদের নিজস্ব সাত মহলা বাড়ী, ব্যাঙ্কের বই এর পৃষ্ঠাগুলিও তাদের ভরে যেতে দেরী লাগে না।

কেবল হতভাগ্য শিক্ষক শিক্ষিকারাই এসব শিক্ষার ব্যবসা কেন্দ্রের বলি হয় না, যেসব দূর্ভাগা এসব কেন্দ্র হতে জ্ঞানের আলো নিতে আসে, তাদেরও দূরাবস্থার সীমা নেই।

আলো বাতাসহীন গোয়াল ঘরের মত পাঠ কক্ষ উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়ায় উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে অসম্পূর্ণ ভুল ত্রুটি পূর্ণ জ্ঞান দান, তদুপরি লটারীর ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবার মতো মর্মান্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি।

এই সব গ্রহ উপগ্রহের সঙ্গে আবার কোচিং ক্লাশের বিজ্ঞাপন, মেইডইজি, সাজেশন প্রভৃতি আকর্ষণে ছাত্ররা বিভ্রান্ত। কোনটা ফেলে কোন্‌টা অন্ধের মত ধরতে যাবে।

চতুর্থতঃ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে চলেছে নানা রকম ছেলে খেলা। ফলে কোন প্রশ্নপত্র হচ্ছে নির্দিষ্ট পাঠ্যের তুলনায় অতি সোজা, কোন প্রশ্নপত্র পাথরের মত কঠিন, কোন প্রশ্নপত্র হয়ত বিষয় বর্হিভূত বা সিলেবাস বর্হিভূত। এ যেন গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

পঞ্চমতঃ প্রায়ই শোনা যায় অমুক অমুক ছাত্রছাত্রীর ফল অসমাপ্ত বলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেন? কি অপরাধে এদের ভাগ্য বিমুখ? না অপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদের নয়—তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের। খোঁজ নিয়ে হয়ত দেখা গেল তাদের উত্তর পত্র দিয়ে মুদীর দোকানে সওদা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। অথবা বিক্রিওলাদের থলেতে তাদের উত্তরপত্র। এ সবের কারণ কি বুঝলেন?

তা আর বুঝবো না? স্বাধীনতা উত্তর সব বিভাগে যেমন ঘুণ ধরেছে। দায়িত্ব জ্ঞান হীন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সৌজন্যে হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্র হয়ত ট্রেনে, ট্রামে, বাসে পড়ে থাকছে। কোন বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির চোখে পড়লে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করা হয়, উত্তর পত্রগুলি কিলো দরে বিক্রি করে আর্থিক লাভ ঘটে।

ঐদিকে যে হতভাগ্য ছাত্র বা ছাত্রীদের উত্তরপত্র হারিয়েছে তাদের কপাল ভেঙ্গেছে। প্রথমতঃ তাদের নামের পাশে লিখে দেওয়া হল রেজাল্ট ইন্‌কম্পলিট্। পরে খুসী মত নম্বর দিয়ে তাদের কপাল পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এই যে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার জন্য কতকগুলো ছাত্র ছাত্রীর সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে—তার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যেমন কোন অনুশোচনা দেখা যায় না। বোর্ডেরও কোন কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে মনে হয় না।

তাই প্রতি বছরই একই পরিণতি দেখা যায় হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের অদৃষ্টে।

বলুন, এরপর যদি ছাত্র সমাজে প্রলয় কাণ্ড ঘটে যেতে দেখা যায়, তবে তাদের দোষী করা কি উচিত?

এসব ছাত্র অন্দোলন রুখতে হলে যে অনেক রদ বদলের প্রয়োজন। কেবল হিতোপদেশ বা নীতিবাক্য শুনিয়ে ছাত্র সমাজকে সংশোধিত করা চলবে না।

আর একটা বড় প্রব্লেম থেকে যাচ্ছে। এইভাবে হোঁচট খেয়ে খেয়ে পরীক্ষা বৈতরণী পার হয়ে ডিগ্রীর ওভারকোট চাপিয়ে ছাত্ররা যখন সমাজের মাঝে দাঁড়াবে তখন দেখবে, বৃথাই এতগুলি বছর নষ্ট করা হয়েছে। চাকরীর বাজারে সর্বত্র ঝুলছে নো ভেকেন্সি। অথবা কারখানায় কারখানায় কাঁচামালের অভাবে ছাটাই।

এরাও মানুষ। আশৈশব প্রতিকূল গৃহ পরিবেশের সঙ্গে বুঝতে যুঝতে তাদের ধূমায়িত মন উগ্ররূপ নেয় তাদের প্রলয় কাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

তাই আজ সমাবর্ত্তন উৎসবে ছেলেরা মাইক কেড়ে নিয়ে আওয়াজ তুলছে—ডিগ্রী চাই না। চাকরী চাই।

অবশ্য সব ছাত্রকেই ধোয়া তুলসী পাতা মনে করা ভুল।

কিন্তু সেই সব সংখ্যা মুষ্টিমেয়—যারা নকল করতে না পারলে গার্ডকে লাঞ্ছিত করতে দ্বিধা করে না।

অথবা প্রশ্নপত্রের সামান্য ক্রটি ধরে সমস্ত সেণ্টারের পরীক্ষা পণ্ড করে দিচ্ছে। বা ঘুষ দিয়ে প্রশ্নপত্র বের করে আনছে।

কেবল ছাত্রদেরই দোষ নয়। শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় তো আজ পদে পদেই দেখা যাচ্ছে। তাঁরা মোটা বেতনে প্রাইভেট টিউশনি করে চলেছেন। কিন্তু স্কুলের কাজের জন্য যেন তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই।

নিয়মিত পড়াশুনা করে এসে তাঁরা পড়ান না। কোন রকমে যেন সময়টা কাটিয়ে দিতে পারলেই তাঁদের স্কুলের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। মাসান্তে টাকাটা তো পাবেনই। কারণ একবার চাকরীতে স্থায়ী হয়ে গেলে—চাকরী হতে বরখাস্ত করা অত সোজা নয়।

ছাত্রদের প্রতি তাঁদের আর তেমন স্নেহাকর্ষণ নেই। তাদের মঙ্গল চিন্তা যদি তাঁরা করতেন, তবে কি ছাত্রদেরও স্কুল পলিটিক্সে জড়িয়ে ফেলেন ? অথবা নিজেদের সার্থ সিদ্ধির জন্য এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অন্য শিক্ষক ছাত্রদের এইভাবে উস্‌কিয়ে দিতে পারেন ?

তামাম দুনিয়ার চেহারাই যেন বদ্‌লে গেছে। তাই আমাদের যুগে শিক্ষক-ছাত্রর সেই মধুর সম্পর্ক আর নেই। ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে না শিক্ষকদের। করে না সম্মান তাঁদের। শিক্ষকদের মন হতেও ছাত্রদের জন্য স্নেহ, সহানুভূতি সব যেন মুছে গেছে। তাই তাঁরাও আগের মত মন প্রাণ ঢেলে তাদের গড়ে তুলবার মত উৎসাহ আর পান্ না।

কি করে এ সবের প্রতিকার করা যায় ?

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়ত বর্ত্তমানে সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত।

শিক্ষাখাতে বেশী টাকা ব্যয় করা উচিত। অস্বাস্থ্যকর উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব বা লাইব্রেরী বা শিক্ষার এপারেটাস যে সব স্কুলে

নেই—তেমন ব্যবসাদারী স্কুল গুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত সরকার হতেই।

বোর্ড ও ডি, আই যে হাজার হাজার টাকা স্কুলের উন্নতির জন্য দিচ্ছে তার হিসাবপত্র চরিত্রবান পরিদর্শক দ্বারা যখন তখন পরীক্ষা করানো উচিত।

পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। দায়িত্ব জ্ঞানহীন শিক্ষকদের প্রশ্নপত্র তৈরী করতে দেওয়া উচিত নয়। এবং প্রশ্নপত্র প্রকাশ হয়ে পড়লে তার জন্য দায়ী যে, তার কঠিন শাস্তি বিধান করা উচিত।

মেডইজি কুইক আন্সার সাজেশন ও টিউটোরিয়েল হোমগুলির বিলোপ সাধন করা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষকদের ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকদের চরিত্র সংশোধিত করতে হবে। শিক্ষকতার নামে ১০—৪টা সময় না কাটিয়ে তারা যথার্থই ক্লাসে কিছু জ্ঞান দান করছেন কিনা সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

তাঁদের প্রাইভেট টিউশনি সীমাবদ্ধ করতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক, জনসাধারণ সকলকেই সংযমী হতে হবে। আদর্শবান্ হতে হবে। যথা সম্ভব দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

হতে হবে ছাত্র সমাজের প্রতি স্নেহশীল, সহানুভূতিশীল। প্রতাপ বল্লে—যাক্ এ প্রসঙ্গ আজ থাক্। তবে ঘুণে ধরা এই শিক্ষা ক্ষেত্রের সংস্কার আমার আপনার একার শক্তিতে যখন সম্ভব নয়, কিন্তু এই নোংরামীর মধ্যে যখন আমরা মিশে যেতে পারবো না, তখন আমাদের সরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তাই এই বয়সে অন্য তরীতে উঠবার জন্যই আজ এসেছি। আদর্শের মোহ আজ মন হতে ঝরে পড়েছে। তাই শিক্ষা মন্দিরের ক্লেদ দেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সরে এসেছি।